প্রতিকৃতি ও অলংকরণ : শিশির ভট্টাচার্য্য

আত্মস্মৃতি

সকালবেলার মাঝামাঝি

হাসান আজিজুল হক

আমি সকালে যা জানি, দুপুরে তা মুছে যাবেই। দুপুরবেলাটা একদম আলাদা। আমি জানি অশরীরীরা বাতাস নয়, তবে তারা বাতাস দিয়ে তৈরি আর ইচ্ছে করলে বাতাসের মতো আমাদের স্পর্শ করতে পারে কিংবা ধাক্কা দিতেও পারে। আমি আরও জানি, তারা কিছুতেই দেখা দিতে চায় না, এমন করে লুকিয়ে থাকে যে হাজার খুঁজেও তাদের দেখা মেলে না। তবে দেখা না দিলেও তারা জানান দিতে ঠিকই পারে। বাতাস যেমন দেখা না দিলেও জানান দেয়। সব করতে পারে বাতাস, তোমার গায়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে; রোদে-ছায়ায় মিশে আসতে পারে তোমার কাছে। আগুনের মতো গরম, বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে বইতে পারে তোমার ওপর দিয়ে, ফর ফর করে শুকনো পাতা ঝরিয়ে ফেলতে পারে, পারে ধুলোর ঘূর্ণি তুলে তোমাকে উড়িয়ে নিতে। এসব তো পারেই। আর সেই সঙ্গে শুইয়ে দিতে পারে বড় বড় দালান-কোঠা, শাল সেগুন বট অশথগাছ। বাতাস না হয়েও অশরীরীরা এই সবই নাকি করতে পারে। তবে যখন তখন নয়, তাদের জানান দেওয়ার সময় মোটামুটি দুটি—এক ভরদুপুর; ঠিক দুপুর যখন দুপুর ছাড়া আর কিছুই নেই। ঠা ঠা দাঁড়িয়ে থাকে একমাত্র দুপুর আর সব শূন্য, ফাঁকা। আর একটা সময় হলো নিশুতি রাত, মাঝরাত; সে-ও ঠিক দুপুরের মতো, আকাশে মাথা তুলে সব ঢেকে ন্যাংটো দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক দুপুর যখন শন শন করছে, লম্বা শুকনো জিভ বের করে চোখের কোণে রক্ত নিয়ে আগুনে চোখে তাকিয়ে আছে, গাঁয়ের রাস্তায় একটি মানুষ নেই, গোয়ালঘরে আঁধার মাচান দেখে বেরিয়ে এসে যে খটাশটা এক-পা দু-পা করে বেরিয়ে এসে এখন রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওর ঘন পাটকিলে রং জ্বলে কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেছে, রোদের চোটে কপিশ রঙের চোখ মিটমিট করে জ্বলছে, ও কিন্তু মোটেই বনবিড়াল নয়, যতই ওকে বনবিড়াল বলে মনে হোক না! ও এখুনি একটা বাঘিনী হয়ে

যেতে পারে, আমাদের একনলা বন্দুক দিয়ে রেমিংটন এক্সপ্রেস ডাবল 'বি' বুলেটও যদি মারা হয় ওর গায়ে, ওর কিছুই হবে না। একটা গরম বাতাসের হলকা হয়ে ও বাতাসেই মিলিয়ে যাবে।

এই রকম একই কথা যে অমাবস্যা লেগেছে তবে এখনো ঘোর অমাবস্যার 'খ্যন'-টি এখনো আসেনি। আসবে ঠিক একটা কুড়ি মিনিটে। টিপি টিপি বৃষ্টি শুরু হয়েছে বিকেল থেকে। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি চলছে এখন, শীত শীত করছে একটু, বৃষ্টিটা বাড়ছে, রাত নিশুতি হচ্ছে দিনদুপুরের মতোই। কাউকে কিছু না বলে আমাকে এখন কোঠাবাড়ি থেকে নেমে যেতে হবে। ঠিক খ্যন-এ বলি হবে এক জোড়া পাঁঠা। রোগা-সোগা, ছোট-মোটো যাই হোক এক জোড়া পাঁঠা তো বটে। বামুনদের ছেলে নেনো আমাকে বলেছে, তুই তো মোচলমান, তুই দেখতে পাবি কি না জানি না। কিন্তু আমরা পেত্যেকবার দেখি যে বলিটা হলো, রক্ত ছিটকে পড়তে লাগল আর মা একবার নড়ে উঠল, চোখের পাতা উঠল নামল, মায়ের টকটকে লাল জিভ-ও নড়ে উঠল। আমরা পেত্যেকবার দেখি। হুঁঃ, ওদের সব ওই কাণ্ড! একই জিনিশ একজন দেখতে পেলে আর একজন পেলে না?

আমাদের গাঁয়ে এই একটিই কালীপুজো। পাঠশালার হেডপণ্ডিত দাশরথি পাঠক মশাইয়ের বাড়িতে এই পুজো হয়। গৃহদেবতা তো, তাই নিত্যপুজো হয় বেলা এগারোটায়। চালকলার প্রসাদ পায় ওখানে যারা থাকে পুজোর সময়। তবে কালী সারা বছরই থাকে খড়ের কাঠামোয়। শুধু এই কার্তিক মাসে দুর্গাপুজোর ঠিক পরের অমাবস্যায় কালীর মূল পুজোটা হয়। এক দুমাস আগে থেকেই আমি দেখতে যাই। খড়ের কাঠামোয় মোটা করে কাদা দিয়ে এক মেটে করা হচ্ছে, শুকিয়ে গেলে আবার কদিন পরে দু মেটে, তারপর কুমোর এসে পণ্ডিতের বাড়িতেই বাস করছে। বালি-মাখানো মাটি দিয়ে এমন পলেস্তরা হলো যে মূর্তি একেবারে ঠিকঠাক—কোমরে নৃমুণ্ড, গলায় নৃমুণ্ড। পায়ের তলায় মহাদেব, তার মাথায় চক্কর ধরা গোখরে সাপের মুকুট, তার পরে শাদা করে খড়িমাটির গোলা-মাখানো আর সব শেষে কুচকুচে কালো রং। ভুষোকালির সঙ্গে বেলের আঠা মিশিয়ে তৈরি এই রং, আলোতে ঠিকরে পড়ে। তারপরে সেই সময় ধুলোর গন্ধ, বেলপাতার গন্ধ। নিমপাতার গন্ধ নাকে এসে লাগে। কাজেই বলির সময়টায় আমাকে থাকতেই হবে। কালী নড়ে কি না দেখব না?

আমাদের একটা অ্যালার্ম দেওয়া গোল ঘড়ি ছিল। একদৃষ্টে চেয়ে আছি, কখন একটা বাজে। ঠিক একটায় নেমে যাই। চটচটে আঠালো কাদার পথে নামি, বেশ হিম হিম লাগে। টিপ টিপ বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। কার্তিকের বৃষ্টি, গায়ে যেন বিঁধে যাচ্ছে। আকাশ পৃথিবী আঁধারে মোড়া। সামনের বাঁকটুকু পার হতেই হ্যাজাক আর ডে-লাইটের আলো খানিকটা জায়গাজুড়ে শাদা গোল একটা ফুলের মতো ফুটে আছে। পা-ভর্তি কাদা আর ভেজা মাথায় মণ্ডপে হাজির হয়েই বুঝতে পারি ঠিক সময়ে এসেছি আর একটু দেরি হলে কিছুই দেখতে পেতাম না। মা কালীর টকটকে লাল জিভ থেকে এখুনিই যেন রক্ত গড়াচ্ছে। জিভ কি অতটা বার করা যায়? কালী বলেই বোধহয় পেরেছে। জিভ কেটেছে তো সোয়ামিকে পায়ের তলায় দেখে! শাদা বড় বড় দাঁত জিভের ওপর কেটে বসানো! এক হাতে সিঁদুর-মাখানো খাঁড়া, বাকি তিনটি হাতেও নানারকম অস্ত্র আর হ্যাঁ, এক হাতে দাঁত-কপাটি মারা অসুরের কাটা মাথা। চারদিক ধোঁয়ায় আঁধার। বেলপাতা, আমপাতা, দেবদারু পাতায় মেঝে ঢেকে গিয়েছে, ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ার সঙ্গে কত রকমের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। ঠিক কথা বটে, কালী এখন জ্যান্ত, কথা বলতেও পারে। অথচ সারা বছর শুকনো পুরোনো খড়ে মোড়া কাঠ-বাঁশের কাঠামো মণ্ডপের চাতালে একা পড়ে থাকে। দিনে-রাতে ঝড়ে-বৃষ্টিতে রোদে-হাওয়ায়। দুপুরে সারা গাঁয়ের নির্জনতার মধ্যে একা, কেউ ফিরেও দেখে না। ক্বচিৎ কখনো গাঁয়ের কোনো মানুষ সামনে এসে ঝুঁকে পেন্নাম করে গেল—হিঁদুরাই বটে তবে দায়ে পড়লে মুসলমানদেরও কেউ কেউ বাদ যায় না। একবার দেখেছিলাম, গোলামের মা কালো কিটকিটে বুড়িটা, কাঁচাপাকা চুল ছড়িয়ে দিয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে কালীর থানে এসে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অভিশাপের চূড়ান্ত করতে লাগল আর কালীর কাছ থেকে খুব খারাপ খারাপ জিনিশ চাইতে শুরু করল, হেই মা, হেই মা কালী, তুমি হিঁদুরের হলে হওগা, খালি একটা কথা শুধুই যে প্যাটের ছেলে আমাকে ভাত দেয় না, কাপড় দেয় না, এই দ্যাখো ত্যানা পিঁদে আছি, তা সেই বাঁশে-চাপা পুতকে তুমি দুনিয়া থেকে তুলে নাও, মা। আবার গতর-খাগী লাতিনী চাপানো আমার ঘাড়ে, তার পেঁদনেও ত্যানাও নাই, ছি ছি ছি, এত লোকের মরণ হয়, তোর কপালে কি দড়িও জোটে না র‍্যা? মা, ওকে তুমি লাও, বাজ ফ্যালো মাথায়, গাড়া-চাপা দাও। এসব বলে বটে, সবাই জানে গোলাম যদি সত্যিই মরে, তাহলে ওই বুড়িই এসে আবার এক পায়ে দাঁড়িয়ে মা কালীকে গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে। মণ্ডপে এসে যদি না-ও পারে, বাড়িতে বসে বসেই সে পাড়া মাথায় তুলবে।

পুজো শুরু হয়ে গেল। এক জোড়া ঢোল, দু-তিনটে বড় কাঁসি ছোট কাঁসি, একটা ডগর আর একটা সানাই একসঙ্গে ঝাঁ-ঝাপড় কাঁই না-না, কাঁই না-না করে বেজে উঠল। একটু বাদেই কানে তালা ধরে এল, মাথায় যেন নেশা ঢুকে গেল, কোথায় আছি, কী করছি, দিন না রাত সব গোলমাল হয়ে এল।

বাজনদারদের সবার কপালে সিঁদুরলেপা, বৃষ্টিতে ঘামে ভেজা চকচকে মুখের ওপর সিঁদুর গড়িয়ে নামছে, চিৎকার করে পুজোর মন্ত্রপাঠের শব্দ শোনা যাচ্ছে, হাড়িকাঠের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা ভীষণ বদমেজাজি খাঁড়াটি বাসু কামার এইবার হাতে তুলে নিল আর ঠিক দেখাও গেল না কখন ভিজে চুপচুপে কালো পাঁঠা জোড়ার একটাকে হাড়িকাঠে তোলা হলো, মা মা মা শব্দের সঙ্গে ঝপ করে খাঁড়ার কোপ পড়ল। আমি এদিকে দেখিনি, আমি একদৃষ্টে কালী ঠাকুরের দিকে চেয়েছিলাম। তেল চুকচুকে কালো রং আলোয় ঠিকরে পড়ছে, চক্কর-ধরা কেলে সাপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টা বিদ্যুতের বেগে ছোবল মারল আর আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম কালীর চোখ দুটি থেকে তীরের ফলার মতো আলো ছুটে গেল, লম্বা জিভটা একটু নড়ে উঠল আর এক ফোঁটা রক্তও যেন মেঝেয় পড়ল। ওইটুকু দেখেই আমি চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেলাম এক জোড়া পাঁঠার মাথা হাড়িকাঠের পাশেই রাখা হয়েছে। চোখ চেয়ে আছে, জিভ অল্প বেরিয়ে আছে বটে তবে খুব শান্ত, কষ্ট-টষ্ট কিছু নেই। যাই হোক, মা একটু রক্ত খেয়েছে, তাতেই খুশি, জীবন সার্থক হয়েছে তাদের। হাড়িকাঠ যেমন কাঠের, মাথা দুটিও যেন তাই। জীবন্ত পাঁঠার নয়, কাঠ কিংবা মাটির তৈরি।

আমার বন্ধু শেখেদের হবির, আমার চেয়ে মোটে পনেরো দিনের ছোট। সে কেমন গোঁয়ারের মতো, হিঁদুদের দেখতে পারে না! বলে, হিঁদুদের ঠাকুর কিসের লেগে দেখতে যাস, বল তো? ওপরে চাকুম-চুকুম, ভেতরে খড়ের গোঁজা, হিঁদুদের দুগ্‌গা পূজা—এ্যাঃ।

তা হোক গে, আমি ঠিক বুঝতে পারি, সব কিছুতে একটা ভাব আছে। আগুনে হাওয়ায় বৃষ্টিতে মাটিতে গাছে ফলে ফুলে একটা ভাব আছে।

গাঁ থেকে এক ক্রোশ দূরের রেলস্টেশন নিগণ থেকে পুবমুখো সড়ক ধরে দুপুরবেলা ফিরছি। মাঝামাঝি চাঁড়াল-গড়ের বিরাট পাকুড়গাছের ছায়ায় বসে আছি। বসে বসেই খেয়াল করলাম, বাড়িঘর গাছপালার ওপর দিয়ে মেয়ে-মাদারের লাল পতাকাটা একটু বেশি বেশি মাথা ঝাঁকাচ্ছে। ঠিক খেপেছে তাহলে! সবাই জানে মেয়ে-মাদারই খেপে মরদ মাদারের খ্যাপার কোনো ইচ্ছা নেই—সে জানে বউ খেপে গৃহস্থের কাছ থেকে যা আদায় করবে তার বেশির ভাগটা তারই, সে কেন খ্যাপাখেপি করে মরতে যায়। বিকেলের ছায়া নামছে, পাকুড়তলায় বসে বসেই মনে পড়ল আর এক দিন পরেই মাদার-নাচ শেষ আর এই শেষের দিকেই মেয়ে-মাদারকে খেপতে হয়। শুরু হয়েছে পনেরো দিন আগে থেকে—পাড়ার ঈদি, খোকা, কুদু, কিবরিয়া—সব কালো কালো ভীমের মতো জোয়ান মরদরা কোথা থেকে জোগাড় করেছে এক জোড়া আকাশছোঁয়া সিধে বাঁশ। এমন বাঁশ এদিকে হয় না। কোথা থেকে আনা হয়েছে তারাই জানে; বলে, ভাগীরথীর ওপারের পুবের দেশ থেকে। বাঁশ বটে, দেখলে গা শিরশির করে। এক-আধটু যা বাঁকাচোরা ছিল, সেই গিঁটগুলো আগুনে পুড়িয়ে এমন সিধে করেছে যে বাঁশ ঘাড়ে তুললেই মনে হয় আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে। বউ-সাজা বাঁশটা একটু সরু আর ছোট। সারা বছর এই বাঁশ গোয়ালঘরের ঠান্ডা মেঝেয় রাখা থাকে। মাদারের সময় এলে ওদের বার করে সাজানো হয় ফিতের মতো কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে। নীল-শাদায় পুরুষ-মাদার আর লাল-শাদায় মেয়ে-মাদার। একদম ডগায় একটায় নীল পতাকা, আর একটায় লাল পতাকা। সেই লাল পতাকা এখন মাতালের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছে। আর কি আমি বসে থাকি এই মাঠের গাছতলায়! সকালে বিকেলে মাদার নিয়ে পাড়ায় নাচতে বের হয়ে গাঁয়ের মুসলমান পাড়ার মানুষ, সবাই বেরিয়ে আসে। মাদার নিয়ে বেশির ভাগ সময় নাচে কুদু আর কিবরিয়া। বাপ রে, কী গায়ের জোরই না লাগে মাদার নাচাতে! কোমরে মোটা একটা চামড়ার বেল্ট, তাতে একটা গোল গর্ত, সেই গর্তে মাদার রেখে দুহাত ছেড়ে দিয়ে নাচাচ্ছে একবার, তার পরেই আবার সেখান থেকে তুলে রাখছে ভাঁজ-করা কনুইয়ের ওপর, আবার বড় একটা তামার পয়সার আদ্দেকটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে বাকি আদ্দেকের ওপর মাদারের সামান্য একটু কোণ বসিয়ে দুহাত ছেড়ে নাচানো। কুদু আর কিবরিয়া ছাড়া কেউ এসব পারে না। কিবরিয়াকে কখনো মেয়ে-মাদার নাচাতে দিতে চায় না কেউ, সে নির্ঘাৎ খেপবে, খেপলে তার জ্ঞান থাকে না। সারা গা থেকে ঝর ঝর করে ঘাম ঝরতে থাকে, কাঁধের টকটকে লাল গামছা ভিজে যায়, ষাঁড়ের চোখের মতো কুতকুতে চোখ। টকটকে লাল হয়ে যায়। একদম খুনে চেহারা। ঝোঁক উঠলেই সে এই রকম আর কেটে গেলেই বলে, সে কী করবে, রাক্ষুসী বউ-মাদার যে তার ওপর ভর করে। এ জন্য সহজে কেউ তাকে মেয়ে-মাদার নাচাতে দিতে চায় না।

হাঁফাতে হাঁফাতে আমি যখন এসে পৌঁছুই, দেখি, ঠিকই, কিবরিয়া জোর করে বউ-মাদার নাচাচ্ছে। তখন তার ঝোঁক চরমে উঠেছে। আস্তানার খোলা জায়গাটায় ধুলো উড়ছে। কিবরিয়া একবার পাগলা নাচ, একবার রায়বেশে নাচ, একবার মাতাল-নাচ, কী যে উল্টোপাল্টা করছে সেই জানে। দুই চোখ তার বন্ধ, কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। মাদারের ডগায় লাল পতাকা দেখে ভয়

লাগছে, পুরুষ-মাদার কোনোরকমে একটু ঠেকনো দিয়ে যাচ্ছে। বউয়ের দিকে চেয়ে সে যেন খুব ভয় পেয়েছে। পুরুষ-মাদার তো একটা বাঁশ মাত্তর, তারও ভাব দ্যাখো।

এলোমেলো ঝড় উঠেছে মেয়ে-মাদারের মাথায়। মগজ চলকে উঠেছে তার। আমি প্রায় দেখেই ফেললাম, একটি মেয়ে-মানুষ একরাশ লম্বা লাল চুল ছেড়ে দিয়ে মাথা ঠুকছে গৃহস্থের উঠোনে। কী করে শেষ হবে এর? কিবরিয়া কি বেঁচে ফিরে আসতে পারে? প্রচণ্ড ঢোলের শব্দে এখন আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

একটু পরেই একইভাবে নাচতে নাচতে কিবরিয়া আস্তানার ঠিক পাশের বাড়িটির দেউড়িতে ঢুকে পড়ল। এখন সবাই তার অনুগত। মাথা নামিয়ে তার পিছু পিছু বাড়িতে ঢুকছে, মরদ-মাদারের নাচা একদম বন্ধ, বউয়ের কীর্তি দেখছে জুল জুল করে তাকিয়ে। কুদুর কাঁধে হেলান দেওয়া রঙিন কাপড় জড়ানো একটা বেচারা মরদ ছাড়া সেটা এখন আর কিছুই নয়। বাড়িতে ঢুকে সবাই গোল হয়ে কিবরিয়াকে ঘিরে দাঁড়াল, সারা উঠোনজুড়ে নাচতে নাচতে সে উত্তরমুখো উঁচু দাওয়া-অলা মাটির ঘরটার মাটির সিঁড়ির পাশে দড়াম করে আছড়ে পড়ে উঠোনে মুখ ঘষতে লাগল। ওকে চেনে সবাই। কী যে হবে আর কী যে করবে সে, কেউ জানে না। ঝলকে ঝলকে রক্তবমি হতে পারে এখন, এর মধ্যেই শক্ত মাটিতে নাক-মুখ ঘষে ছাল-চামড়া তুলে ফেলেছে, মাদার-বউ ঘরের চালে কাত হয়ে পড়ে আছে আর কেবলই কিবরিয়ার ঝাঁকি খাচ্ছে। বাড়ির গিন্নি আর বউরা এসে দাঁড়িয়েছে। এক বউয়ের চোখ দুটো বড় বড়, প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে সে, চোখের কোণে একটু ভয়ও আছে। কিবরিয়ার বাড়াবাড়ি যখন চরমে পৌঁছুল, একজন কোথা থেকে এসে এক কলসি পানি হুড় হুড় করে ওর মাথায় ঢেলে দিল। কিবরিয়া তখন কাদায় মুখ ঘষতে শুরু করল। গিন্নি বলল, বল বাবা, কী কী চাই আর দগ্ধে মারিস না।

কিবরিয়া দু-তিনবার জানোয়ারের মতো আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে উঠল তারপর ককিয়ে ককিয়ে বলল, আড়াইস্যার দুধ কলমাচাল, দু স্যার আলু, আধস্যার সরষের তেল—কথা তাকে শেষ করতে না দিয়েই গিন্নি বলল, দাঁড়া, বাবা দাঁড়া, দিচ্ছি, আর মাথা-মুখ ঘষিস না। কিবরিয়া কিন্তু থামল না, তেমনি ককিয়ে ককিয়েই বলল, আর আর ওই লাল মোরগটা; ওই যে চরে বেড়াইছে। গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠে বলল, হেই বাপ, মোরগাটা চাস্ না, আমি ব্যাগোতা করি, বাড়িতে ওই একটা মোরগই আচে, ছা তুলে বড় করেছেলম। হেই বাপ।

আমি দেখছি বড় বউয়ের দুই চোখে পানি উপচে পড়ল। তেমনই ঘোরের মধ্যে থেকে কিবরিয়া বলল, মোরগটা চাই, মোরগটা চাই, না পেলে বাড়িতে আগুন লাগবে, আগুন লাগবে।

মোরগটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর কাউকে সে তোয়াক্কা করে না। মাথা উঁচু করে একবার সে ক ক করে। তার নিজের বউদের কাউকে কিছু একটা হুকুম করল। তবে জিত শেষ পর্যন্ত কিবরিয়ারই হলো। দিতে হলো ওকে। তিন-চারজন মিলে ধরল তাকে, আপন মান নিয়েই ধরা দিল সে, বেশি ছুটোছুটি করল না। তাকে ধরে কিবরিয়ার কাছে যখন আনা হলো, লাল লাল চোখের শাদা পাতা ফেলে সে এমন তেরছা চেয়ে রইল যেন বলল, হুঁঃ!

মুসলমান পাড়ার খেলাধুলো আমোদ-আহ্লাদ সবই একটু কড়া ধাতের। উঁচু-নিচু খাল-ডোবা সামনে কী আছে চেয়ে দেখবে না তারা, পড়িমড়ি করে ছুটবে। মহররমের আট-দশটা দিন যা হয় সে আর বলার নয়। কিবরিয়াই সবার আগে চামড়ার মোটা ফিতের তৈরি চাবুক দিয়ে হায় হাসান, হায় হোসেন করতে করতে নিজের পিঠে নিজে ছটাছট এমন বাড়ি লাগায় যে বেচারার পিঠের কালো চামড়া ফেটে দগদগে ঘা হয়ে যায়। সকালে এই রকম করে নিজেকে মারলে তো পিঠে আচ্ছা করে তেল মাখিয়ে বিকেলে আবার সেই একই কাজ করলে। কারুর কথায় সে কান দেয় না। লাঠিখেলার সময় কেউ তার সঙ্গে খেলতে চায় না। কোনো দিকে তাকাবে না, সপাটে লাঠি চালাবে। সে লাঠি কারও মাথায় পড়লে তালু ভেঙে চুর চুর হয়ে যাবে। তাকেও কিন্তু ওই রকম করেই মারতে হবে আবার কথা কী—মরে গেলে যাবে। এই কিবরিয়াই আবার খেলা শেষ হয়ে গেলে একটু মুখ-আঁধারি রাতে যখন গান শুরু করে, আহা কী মোলায়েম করেই না সে গায়, ক্যানে খালি পিঠে ফিরে এলি ওরে ও দুলদুল।

মুসলমান পাড়ায় ঠান্ডা পরব হচ্ছে ঈদ, বকরিদ, শবে বরাত, শবে কদর—এইসব। খুব ঠান্ডা, হই-হুল্লোড় নেই, হুটোপাটি নেই। সকালে গোসল করা, আতর মাখা, লাল তুর্কি ফেজ টুপি পরা, তারপর নামাজ পড়া কখনো মসজিদে, কখনো মাঠে। ফিরে এসে সেমাই খাওয়া—ব্যস। দুপুরে একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া। বকরিদে আর একটু বাড়তি গরুছাগল কোরবানি। এইসব দিনে একজন হিন্দুও এ পাড়ায় আসে না। মনে হয় তারা গাঁয়েই নেই বোধহয়। দেখবি, তোকে সেমাই খাইয়ে দেব—বললেই আঁতকে উঠবে হিঁদুপাড়ার ছেলে। আবার পাঁঠার মাংস বললেই মুসলমান পাড়ার ছেলে ভয়ে

পুজো শুরু হয়ে গেল

কাঁটা হয়ে যায়।

আমি জানি সবকিছুতেই মজা থাকে। ফুলে মধুর মতো। বেশি আর কম। ফুলের গন্ধের মতো। কত রকম গন্ধ, তিতকুটে গন্ধটাও ভালো, বিকট বিচ্ছিরি গন্ধও মন্দ কী, পদ্মের গন্ধ, গোলাপের গন্ধ, ভোরবেলাকার আকাশের গন্ধ, করবীর গন্ধ, ধুতরোর গন্ধ, আকন্দের গন্ধ—শুঁকে শুঁকে শেষ পাই না। তেমনি দেখা। খাঁড়া যখন পাঁঠা দুখণ্ড করছে, মা কালী নড়ে উঠছে কি না দেখি, শবে কদরের জ্যোৎস্না-ভরা মাঝরাতে জানালার ধারে বসে দেখি কখন গাছপালা সারা দুনিয়া আল্লাকে সেজদা করে। সব দেখাই মজার।

বোশেখ মাসের কোনো কোনো দিন বেলা থাকতেই ঈশেন কোণে একটুখানি কালো মেঘ সর সর করে এগোতে এগোতে আর দ্যাখ্ দ্যাখ্ করে বড় হতে হতে নিমিষে সারা আকাশে ভরে ফেলে। একেবারে দিনে দিনেই রাত নেমে আসে আর থমকে থেমে যায় সবকিছু। প্রকৃতি আর নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, আটকে রেখেছে নিজের ভেতরে। তার পরেই একেবারে প্রলয়-ঝড়—বড় বড় গাছগুলো উপড়ে, খড়ের চাল, টিনের চাল উড়িয়ে পুকুরে উথাল-পাথাল ঢেউ তুলে সব লণ্ডভণ্ড ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার! কতক্ষণই বা চলে কালবৈশাখী, দশ-পনেরো মিনিট? থামলেই মনে হয়, যাক, এবারের মতো প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেল দুনিয়া। তারপরে ঝিরঝির করে ময়দা-চালা মোলায়েম বৃষ্টি, মেঘের তালায় সূয্যি, বেলা এখনো খানিকটা আছে। লাল আলো ছড়িয়ে হাসতে হাসতে ডুবছে সূয্যি।

তখুনি বেরিয়ে এল বাগদিপাড়ার দল। পুরোনো ময়লা-কিটকিটে, ছেঁড়া কোঁচকানো দুমড়ানো আলখাল্লা পরেছে সব। এসব রাখা ছিল কালো কালো ফাটা মাটির হাঁড়িতে, মাকড়সার জালের মধ্যে—বাপের রেখে যাওয়া, না বাপের বাপের কে জানে—এই সব অদ্ভুত পোশাকে গাবগুবাগুব ঢোল আর

খঞ্জনি নিয়ে এরা কারা সব কোন্ আজব দুনিয়া থেকে নেমে এল! চেনা নিবারণ বাগদিকেও এখন চেনা যাচ্ছে না। ও যে দিঘিতে শোলার ভেলা ভাসিয়ে লগিটা মাঝ-পুকুরে পুঁতে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মাছ ধরে কে বলবে? মনে হচ্ছে যেন রাজার বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে আসছে। তারা সব গাইছে দেহতত্ত্বের গান। গাইছে চোখ বন্ধ করে, গলার শিরা ফুলিয়ে, গাইছে কেউ ঘষা গলায়, কেউ করকরে গলায়, দু-একটি বালক গাইছে সরু বাঁশির মতো বালিকার গলায়। বোঝা যায়, ভবনদী পেরোনোর কথা বলছে বটে, ভবনদীর অকূল পাথার পেরোবে কেমন করে—তবে ও কেবল কথার কথা—ভবের আনন্দেই মশগুল আছে তারা। বয়ে গেছে ভবসিন্ধু পাড়ি দেবার ডোঙা বানাতে। এ পাড়া ও পাড়ার পথ দিয়ে গাইতে গাইতে দল চলে যাচ্ছে। কেমন করে হবি পার, ওই তুই চোখে দেখবি অন্ধকার, কেমন করে হবি পার—মাটিতে আছড়ে পড়ছিল ভাঙা বুড়োটে গলার চিৎকার, আকাশ ফুঁড়ে ওপরে উঠছিল, এইবার দূরে গেছে, বাতাসের সঙ্গে গান এখন আবার কাছে আসছে, কখনো দূরে যাচ্ছে, শোনা যায়, শোনা যায় না।

এই রকমই নরম শোনায় ফসল তোলার শীতের সময় মাঝরাতের ভোরবেলায় কালুকতাকের ফকিরদের গান। তারা ভিখিরি নয়। তারা বিখ্যাত ফকির বংশ, তাদের জন্য সব পেশাই নিষেধ। তারা চাষ করে না, দোকানদারি করে না, ব্যবসাপাতিও নয়। বছরের শেষ দুমাস গাঁয়ে গাঁয়ে ফকিরি গান করে বেড়ায়। এক এক গাঁয়ে থাকে সাত দিন করে। রাত থাকতে ভোরবেলায় মুসলমান পাড়ায় বাড়ির দেউড়িতে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট গান করে। একই গান, বছরের পর বছর—পয়গম্বরকে ইয়াদ করো, এ আল্লা। পাড়ায় কোনো একটা বৈঠকখানায় এরা থাকে। খুনখুনে বুড়ো বাপ। বসন্তের দাগে ভরা বিরাট মুখ ধবধবে শাদা দাঁড়িতে ঢাকা। মুঘল বাদশা বাবরের মতো। তার ছেলে অবিকল তারই মতো। কম, দাঁড়ি কাঁচা, বাপের চেয়ে একটু কম কালো, চামড়া-মোড়া হাতে শিকরে পাখি। বিকেলের দিকে কোনো কোনো দিন গাঁয়ের রবিফসলের মাঠে গিয়ে একটা দুটো বক বা কবুতর শিকার করে। জমিতে বসে থাকা বকের দিকে লক্ষ করে শিকরে উড়িয়ে দেয়, সে হয়তো দু-তিনবার তার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে ফকিরের হাতে এসে বসে, তিনবারের বার ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখির ওপর। এদিকে বকটা কিন্তু সুযোগ পেয়েও উড়ে যায়নি, ভয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে, এখন মাটিতে পড়ে যখন ঝটাপটি করছে, শিকরে তার চোখে বসিয়ে দিয়েছে নখ, ফকির এসে ছোট্ট একটা চাকু বার করে দেখতে না দেখতে বকের বুক চিড়ে তার টকটকে লাল কলজেটা বের করে শিকরের সামনে ধরল।

এই ফকিররা ভোররাতে গান করে, আমরা লেপকাঁথার মধ্যে শুয়ে শুনি, আমার বিছানা ভিজিয়ে দেবার রোগ আছে, আমি আলাদা শুই। কাঁথা ভেজা, পুরোনো লেপ ভেজা। তবে বাতাস ঢুকতে না দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলে ওই বিছানাটাই গরম লাগে। ঘুমের মধ্যে গান শুনি। সবার ওপরে বুড়োর গলা ট্যাঁ ট্যাঁ করে বাজছে, তারপর গাইতে গাইতে আমাদের দেউড়ি থেকে উঠে যাচ্ছে, পয়গম্বর কো ইয়াদ করো এ আল্লা, কী রকম নরম ভেজা! ঘুমের ঘোরে মনে হয় এরা কারা, কোন দুনিয়ার মানুষ। সেই তাদেরই দিনের আলোয় দহলিজে বসে রান্নাবান্না করতে দেখছি, লম্বা দাড়ি আঁচড়ে আঁচড়ে চামরের মতো করে তুলছে, বোতল থেকে সরষের তেল বের করে মাথায় মাখাচ্ছে। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না এরাই রাতে অমন করে গান গায়!

সাত দিনের দিন সকালবেলায় রোদ উঠলে ওরা বাড়িতে বাড়িতে আসে। রাতের গানগুলো এক-আধটু গায়। ওদের আজ বিদেয় করতে হবে। বাড়ির গিন্নি ধামায় করে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, আনাজ-পাতি এনে ওদের ঝোলায় ঢেলে দেয়। বিরাট বিরাট ঝোলা ভরে নিয়ে গাঁ ছেড়ে ভিন গাঁয়ে যায় তারা। বংশ ধরে ধরে এই রকম করে চলে তাদের। অন্য সব পেশা বারণ তাদের জন্য।

গরমের দেশে ভোরবেলাটা বেশ ঠান্ডা। ফাল্গুনের গোড়ায় স্বভাবকবি পঞ্চা হাড়ির গান শোনা যায় এমনিই ভোরবেলায়। সকালের আলো কেবল ফুটছে, সিধে লগির মতো কালো মানুষ পঞ্চা হাড়ি খাটো ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে ছোট্ট একটা খঞ্জনি বাজিয়ে গাইছে, আমার দিন গেল বিথা কাজে, রাত্রি গেল নিদে, হরি দাও হে পদ। খঞ্জনির ঠিন্ ঠিন্ ছোট্ট ছোট্ট আওয়াজ আর মধুর মতো মিঠে পঞ্চার গলা দূরে ছিল, কাছে এল, আবার দূরে মিলিয়ে গেল।

আসল কথা হচ্ছে জ্যান্ত না মরা? যা আমি প্রত্যেক দিন দেখছি, নাড়ছি-চাড়ছি, হাতে নিচ্ছি, গায়ে মাখছি, ছুড়ছি, ফেলছি তাই যে জ্যান্ত! তারা কথা না বলেও কিছু বলে, কাছে থাকলেই কিছু করে, রেগে যায় কিংবা মুচকি হাসে। আমার একটা লাট্টু ছিল, জ্যান্ত, আমার কথা শুনত। একটু কাকুতি-মিনতি করে কিছু করতে বললে সাধ্যে না কুলোলেও তা করার চেষ্টা করত। লাট্টুটার কী রং কোনো দিন জানি না, রং মুছে গিয়ে একদম কাঠ বেরিয়ে এসেছিল। ছোট্ট আল্, বেঁটে লাট্টু, ডৌলটা খুব সুন্দর। কে যে দিয়েছিল ওটা মনে নেই, আমি কিনিনি তা মনে আছে। এক আনা দু আনা দিয়ে এখন যে লাট্টু পাওয়া যায় মনিহারি দোকানে, কী রকম লম্বা একটা ঠ্যাং, কাঁচা রং, বিচ্ছিরি লম্বাটে, খর খর করে ঘুরতে ঘুরতে দৌড়ে বেড়ায়, তার পরেই কুপোকাৎ হয়ে একদিকে গড়িয়ে পড়ে। কে কেনে ওসব। তার চেয়ে এই পুরোনো লাট্টু সোনামানিক আমার কাছে। সারা গাঁয়ে ওরকম দম আর একটাও নেই। লেত্তিটা একটু লম্বা রাখতে হয়, ডান হাতের কড়ে আঙুলে বেঁধে পুরো লেত্তিটা একটু যত্ন করে লাট্টুর গায়ে জড়িয়ে আলগোছে অথচ গায়ের জোরে ছুড়লে শুধু একটা ভারি বোঁ শব্দ করে ও মাটিতে পড়ে ঘুরতে থাকবে। প্রথমে দেখা যাবে মাথাটা একটু টলছে। তারপর সামলে নিয়ে ঘুরছে, এত জোরে আর এত চুপচাপ যে মনে হবে, ঘুরছেই না, স্থির দাঁড়িয়ে আছে। এই রকম করে ঘুরছে তো ঘুরছেই, একটুও এদিক-ওদিক সরছে না। এদিকে অন্য লাট্টুগুলো কেউ খর খর করে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, দম ফুরিয়ে কেউ কাত হয়ে পড়ছে, কেউ গড়াগড়ি দিতে দিতে দহলিজ থেকে রাস্তায় গিয়ে পড়ছে। আমার লাট্টু একমনে ঘুরছে। মরা সৈন্যের মতো সব কটা লাট্টু কাত হয়ে পড়লে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে এইবার আমারটি একটু একটু মাথা কাঁপাতে থাকে, তারপর এক-আধবার শিউরে ওঠে টুক করে শুয়ে পড়ে।

আবার চকখড়ি কিংবা ইট দিয়ে দাগিয়ে গোল একটা জায়গা করে তার ভেতরে যখন লাট্টুদের লড়াই হয়, তখন আমার লাট্টু অন্য রকম। ঠিক গোলের মাঝখানে পড়ে ঘুরবে, কিছুতেই গোলের বাইরে আসবে না। কাউকে ধাক্কা দেবে না, আর কেউ ধাক্কা দিলে বাইরে ছিটকে পড়বে না। অন্য খেলুড়েদের লাট্টুগুলো কেউ ফিতেয় জড়িয়ে গিয়ে ঘুরবে না, কেউ গোলের ভেতরে না পড়ে বাইরে পড়বে, কেউ গোলের মধ্যে পড়লেও ঘুরতে ঘুরতে বাইরে এসে পড়বে বা অন্য কারুর ধাক্কায় ছিটকে বাইরে পড়ে যাবে। আবার কেউ বা আর সব ঠিক আছে কিন্তু ঘোরা শেষ হলে গোলের বাইরে আসতে না পেরে ভেতরেই থেকে যাবে। আমার লাট্টু তা করে না। গোলের মাঝখানেই ঘোরে বটে। তারপর আস্তে আস্তে দাগের কাছে চলে আসে, বোঝাই যায় না কখন আসে, ঠিক কাত হবার সময় দাগের গা ঘেঁষে পড়ে সুরুৎ করে গোলের বাইরে চলে আসে। ওর দোষ যদি কিছু থাকে তা একটাই, ও কাউকে আক্রমণ করে না, কারও গায়ে পড়ে না, ধাক্কাও দেয় না। তবু সব সময় ও-ই জেতে। লোকে বলে পয়মন্ত লাট্টু। আমি বলি, আমার ছোট ভাই, বুঝমন্ত, জ্যান্ত, তাই কথা বুঝতে পারে, কথা শুনে চলে।

শুধু লাট্টু কেন এ রকম বন্ধু আমার অনেক আছে। শুধু কথা বলে না এই যা! ছুঁলেই তাদের একটা গরম ছোঁয়া পেয়ে যাই, যেন আমার হাত আলতো করে ধরে বলছে, ঠিক আছে—আছি তোমার সঙ্গে। এ রকম বন্ধু হচ্ছে মার্বেল, শাদা পাথরের একটা আর ছোট ছোট কাচের পাঁচটা—কড়ির একটা ঘিঁচে আঁটা, একটা ঢলন আঁটা, একটা সিসের আঁটা আর একটা ঢলন কড়ির পিঠের ফুটোয় ঢালা সিসের আঁটা। তা ছাড়া একটি সিসের ডাং আর একটা তেঁতুলের গুলি, একটা হরিণের শিংয়ের তৈরি গুলতি—কত যে সব প্রাণের বন্ধু আমার। কড়ির কথাটাই আগে বলি। মোটে ছ গণ্ডা কড়ি ছিল আমার। বেশির ভাগ ঘিঁচে কড়ি ছোটখাটো আটোসাঁটো গড়নের, উবুড় করে দিলে দুটো সরু কাঁধ তোলা, আর চিৎ করলেই রোগ-মুখের জিরি জিরি দাঁতের হাসি। আর ছিল কিছু ঢলন কড়ি—সব সময়েই উবুড়, কুঁজো পিঠে চিৎ হবার উপায় নেই। যদিও কখনো কখনো উবুড়ও হতে হয় তাদের। এগুলোর পিঠের দিকে রঙের বাহার। ঘিঁচে হলেও কেউ ঘিঁচে বলে না। নরম ঘিয়ে রং যেন মাখনের মতো চুইয়ে পড়ছে। আমার মোটে চার-পাঁচটা ছিল।

সোনার চেয়ে দামি কড়ি আমার কাছে, হীরের চেয়ে দামি। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক কে? যার সবচেয়ে বেশি কড়ি আছে। একমুঠো কড়ি আর একমুঠো রুপোর টাকা দাও, আমি কড়ির মুঠো নেব। কড়ি খেলতে গিয়ে একটা ভালো কড়ির জন্য মাথা ফাটিয়ে দিতে রাজি আমি। খেলতে গিয়ে কেউ কেঁয়ে করলে আমার রাগ হয় বটে, তবে কড়ি খেলায় কেঁয়ে করা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

মুসলমান পাড়ায় কড়ি খেলি আমরা। হিন্দুপাড়ায় যাই না। হিন্দুপাড়ারও কেউ আসে না আমাদের পাড়ায়। যাদের সঙ্গে খেলি দু-একজন বাদে তাদের কেউ স্কুল-পাঠশালায় যায় না। কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে গরু চরাতে যায়, খাল-ডোবা-পুকুর সেঁচে চ্যাং ছিমড়ি পুঁটি চিঙুরি মৌরলা পাঁকাল শিং মাগুর এই সব মাছ ধরে। গান করে, শিঙ্গির মা শিঙ্গি, কাঁটা মারুঙ্গি, কাঁটা খেলে চুণ চুণ খায়। ওরা হিন্দুপাড়ায় গেলে কাদের সঙ্গে খেলবে? কড়ি, ডাংগুলি, হা ডু ডু আর হিঙেভারি আপন আপন পাড়ার খেলা।

কড়ি খেলায় আমি জিততে থাকলে যতক্ষণ খুশি খেলো আমার সঙ্গে। কিন্তু ছ-সাতটা কড়ি হারলে আমি আর খেলতে পারি না। মোট কটা কড়িই বা আমার আছে? পয়সায় তিনটে পাওয়া যায়। আবার একটিই দোকানে হাড়ি-পাড়ার শেষে শুঁড়িদের বাড়ি। ওই একঘর শুঁড়িই এই গাঁয়ে আছে। অবস্থা ভালো ওদের। দেয়াল-ঘেরা বড় উঠোন, তাতে ফুলগাছের ছায়া। দক্ষিণে বড় দিঘি। দেউড়িতে দরজা আছে, সেই দরজা পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকলেই দক্ষিণদুয়ারি ছায়াভরা একটি চুপচাপ ঘর, তারপর আবার আর একটি দক্ষিণদুয়ারি ঘর, পশ্চিম দিকে রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর। সারা বাড়ি নিঃশব্দ।

উঠোনে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেই হাবুলের বাবা রামনাথ শুঁড়ি খালি গায়ে কোঁচার খুঁট জড়িয়ে কোথা থেকে বেরিয়ে আসে। কোনো কথা না বলে ওর সঙ্গে দু নম্বর দক্ষিণমুখী ঘরে গিয়ে ঢুকি। এখানে কাঠের তাকে থরে থরে সাজানো আছে মাছ ধরার ছোটবড় বড়শি, ভীষণ লোভের নানা আকারের ছিপ, হুইল, তারপর মার্বেল, তারপর কড়ি। ঘিচে, ঘিয়ে, ঢোলন আলাদা আলাদা সাজানো। এ ছাড়া সিসে, শাঁখ—কী না জিনিস পাওয়া যায় এই বাড়ির মতো দোকানে। রামনাথ যেমন শান্ত, তেমনি কড়া, কথা বলেই না প্রায়, একটা দুটো যা বলে ভালো করে শুনতে পাওয়া যায় না। মনে হয় কী সব বিড়বিড় করছে। কড়ি কেনার তো পয়সা নেই, ওসব শুধু চোখে দেখাই সার। একটা দুটো পয়সা যা জোগাড় হয়েছে তাই দিয়ে হয়তো কিনি একটুখানি সিসে। ওই সিসে গলিয়ে হয় বড় একটা ঢোলন কড়ির পিঠ ঘষে ঘষে ফুটো করে তার মধ্যে ঢালব, নাহয় একসের ওজনের লোহার বাটখারার পেছনে গোল গর্তে ঢালব। এতে আঁটা তৈরি হবে। হয় কড়ির আঁটা, নাহয় সিসের আঁটা। আঁটা ছাড়া তো খেলা হবে না।

আমরা কড়ি খেলি হয় চালাচালি, নাহয় দান দান। চালাচালি খেলা তত ভালো লাগে না। মেঝেতে মুখ গুঁজে বসে পালাপালি চেলে যাও। হয়তো একটা দুটো কড়ি জুটল, কোনো কোনোবার একটাও না। এক ঘন্টা খেলার পর হয়তো সব হারলে, নাহয় দু'চারটে কড়ি জিতলে। তার চেয়ে দান দান খেলা অনেক ভালো। বড় বড় দান সাজানো আছে, দূর থেকে আঁটা যদি দানের ওপর কিংবা চার আঙুল ফাঁকের মধ্যে ফেলতে পারলে, তাহলে গোটা দানই তোমার। দান না পেলেও দু-একটা কড়ি পাওয়া যায়ই। এই খেলায় হয় ফতুর নয় রাজা। দুরকম খেলাতেই আমার দুই আঁটা বন্ধু। সিসের আঁটাটা দূর থেকে ছোড়ার আগে চোখ বন্ধ করে বলতাম 'দান দান', দুই আঙুলে আঁটাটাকে একটু আদর করে বলতাম, দান আনিস, যা—বলেই ছুড়ে দিতাম। তার পরেই দেখি, আরে দান একেবারে ছত্রখান, সব কড়ি চারদিকে ছিটকে পড়েছে। কখনো বা দেখি আমার সিসের আঁটা একটু দূরে পড়ে সামান্য এগিয়ে দানের কাছে গিয়ে থামল। চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দান দান বলে কাছে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ, ঠিক চার আঙুলের মধ্যেই আঁটা পড়েছে। তার মানে পুরো দান আমার।

একদিন আমাদের উত্তরের একদুয়ারি ঘরে—হালকা অন্ধকার যেন গায়ে ঠান্ডা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—মাটির দেয়ালে ঢোকানো তাকওয়ালা আলমারির দরজা খুলে কী কী আছে সেখানে খুঁজে দেখছি। কীই-বা এমন থাকবে! নানারকম টিনের কৌটো, বেশির ভাগ ফাঁকা, মরচে-ধরা, পুরোনো ছেঁড়া শাড়ি, কাঠের ওপর নকশা করা ছোট বাক্সো, দু-তিনটে ছেঁড়া দড়ির শিকে, তাতে লাগানো কড়িগুলো ছিঁড়ে নেওয়া, বেতের চাল-মাপা ভাঙা কুনকি, একটা রং-জ্বলা বাঁশের ঝাঁপি। আর এমন একটা গন্ধ পাচ্ছি, কোনো গন্ধের সঙ্গেই তা মেলে না, ধোঁয়ার মতো নাকে ঢুকছে আর নেশা নেশা লাগছে। এমনি করে হাতড়াতে হাতড়াতে পেলাম ছোট একটা কৌটোর পেছনে একটি বড় টিনের কৌটো। তার খানিকটায় জং ধরেছে, খানিকটায় ঘন নীল রং তখনো আছে। তুলতে গিয়ে দেখি বেশ ভারী। এক-দেড় সের ওজন তো হবেই। আর একেবারে ভরা। জোরে নাড়িয়ে দেখি শব্দ নেই, যা-ই থাকুক না ভেতরে, একদম ভর্তি। চেষ্টা করছি ঢাকনাটা খুলতে, পারছি না। জং ধরে আটকে আছে। তারপর একটা ভাঙা ছুরি দিয়ে চাড় দিতেই ঢাকনা খুলে গেল। চোখ ছানাবড়া করে আমি দেখতে থাকি, এক মুঘল বাদশার চুনি পান্না হিরে জহরত মণি রত্ন যেন কৌটোর আঁধার গর্তে লুকিয়ে আছে। তখুনি উবুড় করে ফেলি কৌটো মেঝের ওপর। নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ঝর ঝর, ঝম ঝম, খর খর করে পড়তে থাকে কড়ি গাদা গাদা। সব রকম আছে, ঘিঁচে কড়ি, ঢলন কড়ি, ঘিয়ে কড়ি, পিঠে সিসে-ঢালা বড় ঘিঁচের আঁটা, ঢলনের আঁটা, তিন-চার রকম সিসের আঁটা। জীবনে অত বড় বড় ঘিঁচেও দেখিনি, অত বড় ঢলনও দেখিনি, অত খুদে ঘিঁচে দেখিনি, আবার অত ছোট ঢলনের ছানাও দেখিনি আর সেই মাখন মাখানো ঘিয়ে কড়ির তো গোনাগুনতি নেই। সবার ওপরে রয়েছে শাঁখের মতো বড় এক ঢলন কড়ি। কত বড়! তার পিঠের ওপর চিতা বাঘের মতো বুটি বুটি দাগ।

এই জীবনে আর আমি কিছু চাই না।

হতচ্ছাড়া গাঁ আমাদের। দেখতে একটুও ভালো না। সবকিছুর টানাটানি। আশপাশের অনেক গাঁয়ের কথা জানি। কত কী থাকে সেসব গাঁয়ে। এখানে তার কিছুই নেই। একটা হর্তুকিগাছ নেই, একটিমাত্র অর্জুনগাছ। বড় শিরীষও একটি। চোত মাসে দুপুরবেলায় জোর এলোমেলো বাতাসে বড় বড় শিমের মতো তার শুকনো ফল ঠন ঠন করে আওয়াজ করতে লাগলে একমাত্র ভূতই এসে পা ঝুলিয়ে জুত করে বসতে পারে ওই অর্জুনগাছের ডালে। এ গাঁয়ে একটিও নারকেলগাছ নেই, কেমন দেখতে এই গাছ জানতেও পারলাম না। যেখানে-সেখানে খালি তালগাছ। দিঘির পাড়ে বৈঁচি কাঁটাগাছের জঙ্গলের মধ্যে তালগাছের সারি। কে সেখানে যাবে পাকা তাল কুড়োতে? গেলেই হয় গোখরো, নয় কেলে, নয় চন্দ্রবোড়ার কামড়। ওরা কাঁটা ঝোপের তলায় সবুজ জঙ্গলে থাকতে পছন্দ করে না, পানিতে তো নয়ই, থাকে শুকনো জায়গায়, ইটের ভাটায়, পাকা মন্দিরের দেয়ালের ফাটলে, ইঁদুরের তৈরি গর্তে ঢুকে তাকে খেয়ে তারই বাড়ি দখল করে ঘুমোয়। বিশেষ করে একটু উঁচু জমিতে তালগাছের তলায় শিয়াকুলের জঙ্গলে থাকতে তাদের খুব সুখ।

একদিন শুনলাম নন্দীদের ঘেরা খামারবাড়িতে একটা নারকেলগাছ আছে। নন্দীবাবুর চোখ এড়িয়ে সাবধানে তাদের থম-ধরা খামারবাড়িতে ঢুকে নারকেলগাছ দেখলাম। ও, এমনি দেখতে নারকেলগাছ? তালগাছের মতোই তো। শুধু ওই ভয়ানক করাতগুলো নেই পাতার হাতলে। চারা নারকেলগাছ শুধু পাতারই গাছ, তালগাছের মতোই। ওই ঢাউস ঢাউস পাতা খসে অনেক দিন পরে তবে গাছ বেরিয়ে আসে। নন্দীবাবুর গাছে কোনো দিন নারকেল ধরেনি। এমনি হয় এখানে। কারও বাড়ির বাইরের উঠোনে খড়ের গাদার আবডালে লুকিয়ে আছে একটা আতাগাছ। ইচ্ছে করে দেখতে গেলে তবে দেখা যায়। কিন্তু কোনো দিন আতা পাকতে দেখিনি। আতা ধরত দু-চারটে, তারপর কদিন বাদেই ছোট্ট ছোট্ট কালো পোড়া মুড়ির নাড়ুর মতো শুকিয়ে ঝরে পড়ত।

কী আছে ছাই এই গাঁয়ে? একটা ভালো কুলগাছ নেই, পেয়ারাগাছ নেই, জামগাছ নেই। দু-চারটে বেওয়ারিশ পেয়ারাগাছে পেয়ারা ধরে বটে, মার্বেলের সমান বড় হতেই শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। আর একটা গাছে হয়তো ছোট্ট ছোট্ট ঘটি পেয়ারা, যেমন কষ্টা, তেমনি কাঠের মতো শক্ত বিচি, সাতজন্মে কেউ তাদের পাকতে দেখেনি। কাঁঠালগাছের বালাই নেই এখানে, চোখেই দেখিনি কোনো দিন কেমন এই গাছ। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা ঢাউস কিছু আমগাছের বাগান আছে বটে, তবে ওসব গাছের পাকা আম খাবার কথা কেউ কোনো দিন ভাবেই না। আম পাকতে দেখিনি কখনো। দাঁত আমলানো টক, কাজেই কাঁচা আম নুন মরিচ দিয়ে খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। গাঁয়ের প্রায় সব কুলগাছের কুল বোদা-চোয়াল চেপে ধরত। মাঠের ধারে পুকুরের পাড়ে কটা জামগাছ ছিল, বিচ্ছিরি কাদাজাম, আষাঢ় মাসের লম্বা দুপুরবেলায় একডালে হনুমান আর একডালে আমরা ছেলেরা বসে সেই জামই সাবাড় করতাম। শরিকি লড়াইয়ে হনুমান একবার দাঁত খিঁচোত, একবার আমরা তাকে তাড়া করতাম। তবে একটা-দুটো ভালো জাম, ভালো কুল কি ভালো পেয়ারাগাছ কি আর ছিল না গাঁয়ে? এক গৃহস্থের বাড়িতে ছিল একটি জামগাছ, খেলে বলতে হতো মধু দূরে থাক। তেমনিই কারও বাড়িতে দু-একটি মিষ্টি পেয়ারা বা কুলগাছ ছিল। মিথ্যে বলব না। তবে তাতে আর আমাদের লাভ কী?

একটু সবুজ খুঁজে পাওয়া যে কী মুশকিল এখানে? সব ধুলোয় ভরা। গাঁয়ের রাস্তা গোড়ালি-ডোবা ধুলোয় ঢাকা। এমনকি মরা ঘাসও নেই কোথাও। রাস্তার দুদিকে সারবাঁধা ধুলো-ল্যাপটানো মাটির বাড়ি—একটার পর একটা, গায়ে-গায়ে লাগানো, মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, দুই বড়র মাঝখানে একটাই পাঁচিল। ন্যাংটো উদম মেটে সব বাড়ি। বহুদূর থেকে দেখা যায়। ভুতুড়ে মনে হয়, জনহীন মনে হয়। মরা-মানুষদের মরা বাড়ির সার বলে মনে হয়।

মাঠ আর গাঁ বেশ আলাদা করে দেখা যায় এখানে। মাঠের শেষে সব গাঁ-ই সবুজ ঘন চওড়া রেখার মতো, আকাশের তলার দিকে আকাশের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু দূর থেকে আমাদের গাঁয়ের চওড়া রেখাটার যেন কোনো রংই নেই, পানসে রোঁয়া-রোঁয়া ধুঁয়োর মতো লাগে, দুপুরের রোদে কাঁপতে থাকে। তখন গাঁয়ে ঢুকতে ভয়ই হয়। কোথাও কি একটু ছায়া থাকতে নেই? গাঁয়ের বাইরের দিকে ছড়ানো-ছিটানো বাবলা বনের জন্যই বোধহয় এ রকম লাগে। বাবলার ছায়াতে কোনো রং নেই, গাছের গায়ে সোনালি আঠা, তলায় বড় বড় কাঁটা। একটুও শান্তি নেই। তবে মাঠে এখানে-ওখানে বড় বড় বিশাল বিশাল গাছ আছে বটে—তিন চার রকম পাকুড়, বট, জাম, শেওড়া—সেখানে গেলে ছায়া পাওয়া যায় কিন্তু তাদের ছায়া তো আর গাঁয়ের ভেতরে নেই, সারা মাঠেও নেই। কাজেই গাঁয়ের মধ্যে ধুলোভরা শাদা পথের দুধারে মেটে বাড়ি উদম হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে আর মাঠজুড়ে এখানে ওখানে সেখানে বনকুল, শেয়াকুল, ভাঁট, আশ, ভিতরে-শ্যাওড়া, আকন্দ এসব লতাগুলোর ঝাড় নিজেরাই এত ধুলোমাখা যে ছায়ার কথা মনেই আসে না।

এসব শুধু বদলে যায় বর্ষাকালে।

আমরা তাই ভাত খাই আর ডাল খাই। ডাল খাই আর ভাত খাই। আর আলু খাই। সবাই আলুখোর। পেটপুরে ভাত খাই, প্রায় সবাই খাই, খুব কম দু-একজনের যদি না জোটে, এখনো তারা কারও কাছে মাগতে যায় না, আন্দাজ করে নিতে হয়। তখন দু-এক বেলা তাদের কাছে দু-এক কাঠা চাল পাঠিয়ে দেওয়াও হয়। তাই ভাত সবাই খায়। কিন্তু সবাই ঘন ডাল খায় না। কোনো বাড়িতে ডাল একেবারে পাতলা। গাঁয়ের আশপাশের জমিতে মসুর হয়, মুগ হয়, মাষকলাই হয়, আইরি তেওড়া এসব ওঁচা কলাই হয়, ছোলা মটরও হয়। মোটকথা ঘন হোক, পাতলা হোক ডালটা সবাই খায়। এর সঙ্গে খাই কুমড়োর ছেঁচকি, আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট, সজনেপাতা সেদ্ধ, পুঁই, কলমি আর হেলেঞ্চা শাক। পোস্ত আর বরবটি গাঁয়ের দোকানেই পাওয়া যায়। মরসুম ধরে ধরে

ঝিঙে বেগুন চিচিঙ্গে শিম বেশ পাওয়া যায়। বেগুন খেতে খেতে গায়ে চুলকানি দেখা দেয়, তবু ছাড়া যায় না।

আমাদের জন্য এখানে আর বেশি কিছু নেই। মাছ নেই, মাংস, গোশত নেই। বড় বড় দিঘি পুকুর আছে বটে, সেখানে রুই কাতলা, মিরিক—বিশ সের, তিরিশ সের, একমণ এক একটা—আছে বটে কিন্তু সে আর চোখে দেখতে পায় কজন? বাদগি পাড়া থেকে চুনোপুঁটি চ্যাং ছিমুরি মৌরলা ট্যাংরা চিঙুরি এসব কিনতে পাওয়া যায় কোনো কোনো দিন। না, না, নিত্য মাছ-ভাত আমাদের ভাগ্যে নেই। মাংসও তাই। হিন্দুপাড়ার লোকেরা বছরে একদিন মাংস খায় কি না সন্দেহ, মুসলমান গরু খায় বলে রক্ষে, খেতে পায় কখনো। বকরিদে ভালোই জোটে গোশত। ভারি পছন্দ বলে বছরের অন্য সময়েও জোট বেঁধে গরুছাগল যা-ই হোক কিনে এক-আধটু মাংসের ব্যবস্থা করে নেয় মুসলমান পাড়ার মানুষ। তবে ডিম আর মুরগিটা মাঝে মাঝে জোটে তাদের। ওদিকে আবার হিন্দুদের ডিম মুরগি বারণ। দু-চারজন ডাকাবুকো বেপরোয়া চ্যাংড়া হাঁসের ডিম খোঁজার নাম করে মুসলমান পাড়ায় এসে মুরগির ডিম, মুরগি কিনে নিয়ে রাতে ফিস্টিভোজের ব্যবস্থা করে। তারা চাঁদা করে টাকা তুলে কখনো কখনো একটা খাসি কেটে তার মাংস ভাগ করে নিয়ে অবশ্য খায়।

যাই হোক, কথা এই, আমরা ভাত খাই, ডাল খাই। ধান থেকে যা যা হয়, তার সবই খাই। কারণ ধান, ধান ছাড়া আর কিছুই এখানে হয় না, সে জন্য ধান ছাড়া আর কিছুই এখানকার মানুষ চায় না। আগে ধান, পরে ধান, শেষেও ধান। একেবারে সমতল, টইটক্কর কিছু নেই, মাঠের মাঝখানে যদি দাঁড়াই—আমার মাথা থেকে সিধে ওপরে যেখানে আকাশের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুটা, ঠিক সেই বিন্দুর নিচে একটা খয়েরি চিল আর একটা বিন্দু হয়ে উড়ছে—আমি শুধু দেখি ধান, কাঁচায় সবুজ পাকলে সোনালি, এই দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে একেবারে গোলের গোল এই দুনিয়ায় কেবল ধান আর ধান। এ হলো ধেনো মাটির দেশ, শুকনোয় ছাই ছাই শাদা, ভিজলে কালো। এঁটেল মাটি, শরীরে আঠার মতো লেগে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে পা ধোবার আলাদা বন্দোবস্ত। পিঁড়ি বা মোড়ায় চেপে বসে ঘষে ঘষে কাদা তুলতে হয়। এই মাটির জন্যই কি ধান ছাড়া আর কোনো ফসলই ভালো হয় না। আলু আখ তিল তিসি সরষে মুগ মসুর শসা কুমড়ো সবই হয় তবে ধানের মতো কোনোটাই হয় না। পৌষ-মাঘের রোয়া ধান।

এই কাদাভরা গাঁ! পথে পথে কাদা, হাঁটু-ডোবা, কোমর-ডোবা, মুখ-বন্ধ, ঠোঁট-টেপা কাদা। স্রেফ শুয়ে আছে, অজগরের মতো, সমস্ত গাঁয়ের ভেতরে বাইরে কুণ্ডলী পাকিয়ে। তারপর গাঁয়ের বাইরে এসে একটি মাত্র অজগর হয়ে মাঠ চিরে একক্রোশ দূরে রেলস্টেশনে গেছে। ধানে-ভরা মাঠের ভেতর দিয়ে মাটির এই একমাত্র সড়ক গাঁয়ে গাঁয়ে চলে গেছে। বর্ষাকালের কথা ভাবলে তখন বুকে কাঁপন ধরে যায়, মানুষ যেন আটক আছে।

অজ অজ এই পাড়াগাঁ যবগ্রাম। বর্ধমান জেলার মধ্যে, জেলা-শহর থেকে দশ ক্রোশ উত্তর-পুবে, কাটোয়া মহকুমার মধ্যে, মহকুমা শহর থেকে ছ ক্রোশ দক্ষিণ পুবে, মঙ্গলকোট থানার মধ্যে, সেখান থেকে ক্রোশ তিনেক সিধে পুবে আর গিধ গ্রাম ইউনিয়নের মধ্যে সাতটি গাঁয়ের এক গাঁ। একেবারে ঠিক ঠিক বিবরণ দেওয়া হলো। খুঁজে পেতে আর অসুবিধে হবে না। তবে এমনিতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। শত শত একই রকম গাঁয়ের মধ্যে কোথায় ডুব দিয়ে আছে। গাঁয়ের কেউ দূরে কোথাও তো বড় একটা যায় না। যাওয়ার দরকারও নেই। গাঁ-কে মাঝখানে রেখে ক্রোশ তিন-চার ঘোরাঘুরি করেই সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া। দুনিয়ায় বেরিয়ে যাবার এক পথ আছে—বর্ধমান শহর থেকে উত্তর পুবে কাটোয়া শহর পর্যন্ত মাইল চল্লিশেক মার্টিন লাইনের রেল। মরা লাল রঙের ট্রেন ঘুট ঘুট করে চলে এই লাইনে দিনে তিন চারবার। বর্ধমান কাটোয়া পৌঁছেই অবশ্য সারা দুনিয়া। নিগণ রেলস্টেশন থেকে আধক্রোশ দূরে শের শাহ আমলের পাকা রাস্তা, একদম ঘেঘো কুকুরের মতো ধুলোর মধ্যে কালো কালো পাথর পোঁতা। একটা না দুটো ভাঙা বাস যায় দিনে, বাকি সময়টা ধুলো বাতাস রোদ অন্ধকার আর খড়ি ঠ্যাঙারেদের দখলে থাকে। খড়ি নদীর পাড়ে কর্জনার দিঘির টিলার উপরে কালীমন্দিরে ঠ্যাঙারে ডাকাতরা মাঝে মাঝে নরবলি দেয় আর যাতে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলে তাদের লাশ দিঘির পদ্মবনের নিচে পুঁতে রাখে।

মোটকথা, কেউ কোথাও বিশেষ যায় না। শুধু কিনতে হয় নুন কেরোসিন আর কাপড়। গাঁয়ের দোকানেই নুন কেরোসিন পাওয়া যায়, কাপড় পাওয়া যায় রেলস্টেশন নিগণে। আজকাল কয়লাও কিনতে হচ্ছে। বাঁচবার জন্য এইটুকুই! তবে মজা করে বাঁচার জন্য, মুখের স্বাদ ফেরানোর জন্য যা যা কেনা যায়, সে তো আলাদা কথা। কত রকম মসলা আছে, তেজপাতা, গোলমরিচ, এলাচ, লবঙ্গ, ছোবড়া লাগানো নারকেল, পোস্ত বরবটি। তা ছাড়া যে যেমন পারে কেনে। গাঁয়ের মানুষ যা-ই কিনুক, বেচে কিন্তু শুধু ধান। আর তাদের বেচবার তেমন কিছু নেই।

গরুর বা মোষের গাড়িতে ধান বেচতে যাচ্ছে নিগণের আড়তে। শীত আর গরম কাল ছাড়া ধান বেচতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। সড়কে তখন থাকবে কাদা। এক ক্রোশের মধ্যে তিন-চারটে কাদার গড় আছে, বিধেতা পুরুষ ছাড়া আর কেউ জানে না কোনটাতে গিয়ে চাকা আটকে যাবে। গাঁয়ের লাগাও এক নম্বর আর দুই নম্বর ডহরের কাদা কোনোরকমে পার করলেও তিন নম্বরে সড়ক কোমর ভেঙে দুখণ্ড হয়ে আছে সেই কবে থেকে। অমন হাতির মতো বড় বড় মোষ গোটাটাই প্রায় গেড়ে যায়, জেগে থাকে শুধু শিরদাঁড়াটা, জোয়াল ফসকে বেরিয়ে যায়। যদি বা কোনগতিকে কাদা পেরোল, সড়কে ওঠার সময় মোষ জোড়ার মুখে ফেনা ভাঙছে, চোখ কুতকুতে লাল, চাকা ঠেলতে গিয়ে গাড়োয়ানের ঘাড়ের রগ দড়ির মতো জেগে উঠেছে, চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। এত করেও যদি গাড়ি না ওঠে তখন ধানের বস্তা নামিয়ে গাড়ি ফাঁকা করে গাড়ির চাকা জোয়াল সব আলাদা করে খুলে ফেলতে হয়।

এমনি করে ধান বেচা। পারলে কেউ বেচে? কিন্তু আর যে কিছুই বেচার নেই, সংসারেই তো লেগে যায় সব। কলাই সরষে, গুড় শণ পাট সবই খরচ হয়ে যায় বাড়িতে। আলু বেগুন কুমড়ো ঝিঙে শসা ফুটি বেশি ফললে হাটে কিছু বেচা যায় বটে। তবে সে আর কত। অবশ্য টাকা-ফাকা আর দেখছেই বা কজন। নেই তো তেমন কারও কাছে। এক শ টাকার নোট কি সহজে চোখে পড়ে? এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোট আর রুপোর টাকা, আধুলি, সিকি, আনি, দুয়ানি তামার পয়সার খুচরো—এতই কাজ চালায় লোকে। মহাজন, আড়তদার, বড় দোকানি অবশ্য ঠনঠন করে টাকা গোনে আর থাক দিয়ে দিয়ে রাখে। তারা ধান কেনে মোকামে, অনেক আড়ত। গদির বাইরে নিকনো তকতকে চাতালে আকাশছোঁয়া সোনার পাহাড়, ধানের স্তূপ, হিন্দুদের পুজোর নৈবেদ্যর মতো সাজানো। একপাশে ধান মাপার কাঁটা ঝোলানো, পাশে লোহার হন্দর আর অন্য সব বাটখাড়া। একদিন বিকেলে ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমে দেখি আড়তের পর আড়তের সামনে ধানের পাহাড়, বিকেলের রোদে ঠিক যেন ঝকমকে সোনার পাহাড়। অগুনতি পাহাড়। কোথায় ছিল এত ধান? যখন মাঠে ছিল কিছুই তো বোঝা যায়নি, এক একটি শীষে মোটে একটি গুচ্ছ ধানের ঝলক। এখন এই ধানের পাহাড়গুলো যাবে কোথায়? ঠিক দুই দিন পরে এসে দেখছি, সব উধাও, কোথাও একটি ধান পড়ে নেই। শালিক ঘুঘুর খাবার জন্যও নেই একটি দানা। আড়তগুলোর উঠোন ঝাঁটপাট দেওয়া, নিকনো। গত হাটে হয়েছিল ধান কেনা, পাঁচ দিন আগে, এর মধ্যে চালান হয়ে গিয়েছে মাল গাড়িতে।

এক মণ তিরিশ সের, হলো? দু মণ এক সের আট ছটাক, হলো? যে ওজন করছে সে চেঁচিয়ে বলছে। গদির মধ্যে ঠন ঠন টাকা বাজছে। তিন মণ ওজনের ভারী আড়তদার বলছে, এই ছোঁড়া কোথা র‍্যা, বাই সরিয়ে দিয়ে যা, আটকে গেছে। অত ভারী পাছা তার পক্ষে তোলা সম্ভব নয়। পাশেই ময়রার দোকানে রসগোল্লা, জোড়া মণ্ডা, নীল মাছি, কাঠের থালায় বাসি ফুলুরি, ঝারবড়া, আলুর চপ। কী আর করা যায়, দারুণ খিদে চাপা দেবার জন্য এক আনার ফুলুরি খেয়ে তোবড়া টিনের গ্লাসের এক গ্লাস জল শেষ করল ধান বেচা চাষি।

আমাদের গাঁয়ে পাগল ছিল মোটে তিনজন। এদের মধ্যে একজন আবার এক বছর পাগল তো পরের বছর ভালো। শুধু তাই নয়, বায়নাক্কা তার অনেক। চৈত-বোশেখ ছাড়া সে পাগল হবে না। এ জন্য লোকে তাকে সমীহ করে বলত চৈত-পাগল। এই লোকটিই হলো, বললে বিশ্বাস হবে না, গাঁয়ের একমাত্র গুঁড়ি-বাড়ির কর্তা রামলাল গুঁড়ি। মোটা ফর্সা লোকটা, পরিচ্ছন্ন, সব সময়ে যেন স্নান করে আছে। কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে ভেতর বাড়ির দোকানে এসে জিনিস বেচত। মুখে কথাটি ছিল না, খুব নিচু গলায় বিড়বিড় করে দু-একটি কথা বলত আর তাকে রাখা বড়শি-টরশিতে হাত দিলেই আলগোচে কেড়ে নিত। এই লোকটাই একদিন বেলা একটু চড়লে, গরুর গোয়ালের মোটা একটা বাঁশের হুড়কো হাতে আস্ফালন করতে করতে বেরিয়ে আসত গাঁয়ের রাস্তায়। ষাঁড়ের গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আকাশ ফাটাত লোকটা : কই, কোনদিক দিয়ে আসবি আয় দেখি, দেখি তোর ক্যারদানি। কোথা লুকিয়ে আছিস চলে আয়। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে, খাটো ধুতির কাছা খুলে ধুলোয় লুটোচ্ছে, কোনোদিকে খেয়াল নেই। বন বন করে চোখের তারা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে মরছে, গেল বারে এলি, তিনজনকে নিয়ে গেলি, সূয্যি উঠল না তিন দিন, কোন দিক দিয়ে এলি, কোন দিক দিয়ে গেলি, এখন আয় একবার সামনে মুণ্ডু গুঁড়িয়ে দেব। ধপাস ধপাস করে হাঁটে আর বকে। তখন সামনে কেউ পড়লেই হুড়কো তুলে মারে আর কি। ঘণ্টা দুয়েক এমনি করে সারা গাঁয়ের রাস্তা ঘুরে শেষ পর্যন্ত বাড়ি চলে যেত সে। তারপর কদিন একদম চুপচাপ। রামলাল বেরিয়েছে শুনলে রাস্তায় ছেলে-ছোকরা নেই একটিও, আমরাও ওই কদিন কোনো দরকারেই গুঁড়ি-বাড়ি যেতাম না। একবার হঠাৎ তার সামনে পড়ে গিয়েছিলাম, মাথার ওপর হুড়কো তোলা, পালাবার আর তখন কোনো উপায় নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, রামলাল আমার দিকে চেয়ে দেখলও না, চিৎকার করতে করতেই চলে গেল।

আর এক পাগল ছিল চক্রবর্তীদের জামাই। তিনি বোধহয় ঘরজামাই

পুষ্পদি হাত বাড়িয়ে তার গালে হাত রাখল

থাকতেন। তাঁকে দেখতে চাইলেই দেখা যেত চক্রবর্তীদের বৈঠকখানায়। বৈঠকখানার ভেতরের দাওয়ায় তিন জোড়া চমৎকার নকশা করা শালকাঠের খুঁটি। সেখানে মাঝখানের জোড়া খুঁটিতে লোহার শিকলে বাঁধা থাকত লোকটা। শ্যামলা রঙের স্বাস্থ্যবান সুন্দর দেখতে একটি মানুষ যখনই গিয়েছি, দাঁড়িয়ে আছে, কখনোই বসে বা শুয়ে থাকতে দেখিনি। চুপচাপ হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে, কাঁচা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে বড় বড় দুই চোখের চাউনিই আগে চোখে পড়ত। পায়ের কাছে খয়েরি রঙের শক্ত মল, এই মোটা নের, আস্তে আস্তে শুকিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে মেঝের খানিকটা প্রস্রাবে ভেজা।

এই পাগলের কোনো উপদ্রব নেই। তবু তাকে কেন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো জানি না। হয়তো কোথায় না কোথায় চলে যাবে, ডুবে মরবে কি গাছে দড়ি দিয়ে ঝুলে থাকবে কিংবা কোনো বাড়ির অন্দরে গিয়ে ঢুকে পড়বে বোধহয় এ জন্যই তাকে বেঁধে রাখা হতো। যাঁর জামাই, চক্রবর্তীদের তিন ভাইয়ের বড় ভাই তিনি, ভারি মজার লোক আর ভারি সরল লোক। স্থির হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতে পারতেন না। সব সময় পায়চারি করতেন আর বটে বটে, বেশ বেশ—বলে অন্যের কথায় সায় দিয়েই যেতেন। এই লোকটিই কখনো কখনো বৈঠকখানার সামনের দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে অসহায় বোকার মতো চুপ করে বসে থাকতেন সামনের দিকে চেয়ে।

একদিন খুব চুপ, ভয়ানক এক দুপুরবেলায় সে এমন চুপ যে ঠক করে শুকনো একটা পাতা খসে পড়ার আওয়াজেও চমকে উঠতে হয়, আমি চক্রবর্তীদের বৈঠকখানার দিকে চেয়ে দেখি পুষ্পদি বৈঠকখানার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বামীর মলমূত্র কে আর পরিষ্কার করবে, তাকেই করতে হয়। পুষ্পদিকে কবে থেকে দেখে আসছি। চক্রবর্তী বাড়ির বড় মেয়ে, কী যে দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রং আর কী যে কাটা কাটা সুন্দর চেহারা, শুধু চুলগুলো কোঁকড়া আর খাটো। এখন ঘন কালো কোঁকড়া চুলের মধ্যে দু-চারটে শাদা চুল দেখতে পাওয়া যায়, বেলেমাছের মতো একটু ফ্যাকাশে মরা মরা হয়ে এসেছে গায়ের রং, যেন রক্ত নেই শরীরে। পুষ্পদির বয়স হচ্ছে তো! হাতে একটা ভাঙা টিনের মধ্যে স্বামীর গু-মুত নিকিয়ে তুলে নিয়েছে সে। আগেও এ রকম করতে দেখেছি। আমার গা গুলিয়ে উঠত অমনি করে পরিষ্কার করতে দেখে কিন্তু পুষ্পদির মুখ দেখে একবারও মনে হতো না যে তার একটুও ঘেন্না ঘেন্না লাগছে। মুখে একটু হাসি যেন লেগেই আছে।

আমি দেখলাম পুষ্পদি ভাঙা টিনটা আর হাতের ঝাঁটাটা একদিকে নামিয়ে রাখল। তার মাথায় ঘোমটা নেই। আমি জানি সে যদি এ গাঁয়ের বউ হতো, তাকে ঘোমটা ছাড়া দেখা যেত না। যতই বয়স হোক, যে কাজই করুক, পথে-ঘাটে ভিন-গাঁয়ের বউদের মাথায় ঘোমটা থাকবেই। কিন্তু গাঁয়ের মেয়েরা কখনোই কারও সামনে ঘোমটা দেবে না। একমাত্র স্বামীর সামনে ছাড়া। পুষ্পদির এখন স্বামীর সামনেও ঘোমটা নেই। স্বামী পাগল বলেই কি? স্পষ্ট দেখলাম জামাই লোকটার দিকে এগিয়ে গেল পুষ্পদি। মাথা খালি, আঁচলটা কোমরে জড়ানো। লোকটার একেবারে সামনে গিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল সে। আমি আড়ালে দাঁড়িয়েছি, আমাকে দেখতে পাচ্ছে না পুষ্পদি। কেউ কোথাও নেই, খাঁ খাঁ করছে গাঁয়ের রাস্তা, রোদে পুড়ছে। কোনো পাখির ওড়াউড়ি নেই, কিছু নেই, বাতাস নেই, পুষ্পদি আরও এক পা এগিয়ে গেল স্বামীর দিকে, নিজের মুখটা একটু তুলে জামাই লোকটার মুখের দিকে চাইল। চুল গোঁফ দাড়ির ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রোদ-জ্বলা চোখে চেয়ে রইল লোকটা। পুষ্পদি হাত বাড়িয়ে তার গালে হাত রাখল, তারপর আরেক হাত তুলে তার আরেক গালে রাখল, তারপর দুহাতে মুখটা ধরে নিচের দিকে একটু নামিয়ে আনল, তারপর ছি ছি, কী ভেবে লোকটার দুহাত ধরে নিজের বুকের ওপর রেখে দিল। আমি দেখছি, ছি, ছি, কী করল পুষ্পদি! একটু পরেই লোকটার হাত দুটি সরিয়ে আর একবার এদিক-ওদিক চেয়ে টিন আর ঝাঁটা হাতে সে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

এইবার তিন নম্বর পাগল যে সে ঠিক যেন একটা বুড়ো কুকুর। লোকটা মাগা দাঁ-র বাপ, খুনখুনে বুড়ো, কবে থেকে পাগল সেই জানে। গাঁয়ের যে রাস্তাটা দিয়ে আমাকে প্রায়ই যেতে-আসতে হতো—ওদিকেই যে কৎবেলের গাছ, কতবার যেতে হয়, ওদিকেই যে গুলঞ্চ গাছটাতে হলুদ-শাদা-মিষ্টি গন্ধ

ফুল ফুটে থাকে, ননুকাকার বাড়িতে নেমন্তন্নে যেতে হয়, তালশাঁস খাবার তালগাছটা, খেজুর রস চুরির জন্য খেজুরগাছটা—সব ওই রাস্তার ওপারে মাঠের ধারে, আর ঠিক ওই রাস্তারই পাশে মাগা দাঁ-র খামারবাড়ি থাকত বুড়োটা। এক কুঠুরি বৈঠকখানাটা ঠিক রাস্তার ওপরে, তার দাওয়ায় বসে হাত বাড়িয়ে রাস্তার মানুষ ধরা যায়। বুড়ো বসে থাকে দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে আর কেউ গেলেই লোম-ওঠা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। তখন কী যে চেহারা হয় তার! মনে হয়, বিশেষ করে আমি গেলেই তার রাগ বাড়ে। তার চারপাশে নোংরা ময়লা তো আছেই, তার মধ্যে আধ-ন্যাংটো বুড়ো সরু লম্বা হাত বাড়িয়ে দেয়। মুখে একটাও দাঁত নেই, ঠিক যেন খ্যাংড়া-কাঠি—ঘেউ ঘেউ ঘেউ, খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক—নিশ্চয় খুব গাল দেয়। একটা কথাও বুঝতে পারি না, সাঁই সাঁই তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাই। আমাকে ধরার জন্য একবার হাত বাড়ায় আর একবার আশপাশে তার লাঠিটাকে খোঁজে। আমার রাগও লাগে, ভয়ও লাগে। যখন মনে হচ্ছে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে বুঝি, রাস্তার আর এক পাশ ঘেঁষে, দেয়াল ধরে ধরে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছি—হ্যাঁ ঠিক, চোখ বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে—এই পেরিয়ে গেলাম বলে, আচমকা খ্যা খ্যা খ্যা চিৎকার করে তেড়ে এল। 'ওরে বাপ রে' বলে ফিরে দৌড় দিতেই হয় তখন। এই বুড়োটা কিছুতেই মরছিল না।

গাঁয়ের তিন পাগলের কথা বলার সময় আমার বলা উচিত ছিল তিন পাগল আর এক খ্যাপার কথা। পাগল আর খ্যাপা এক নয়। খ্যাপারা খুব বেচারা হয়। যখন তারা রাস্তায় বের হয় আমরা ছেলেরা তাদের পেছনে লাগি, ঢিল ছুড়ি, গায়ে থুথু ছিটোই, কাছা টেনে খুলে দিই। আমাদের গাঁয়ের খ্যাপাটা আমাদেরই পাড়ার খোসাইয়ের ভাই। নাম তার একটা নিশ্চয়ই ছিল, আমাদের কারও তা মনে নেই। সে হলো খ্যাপা, খোসাইদের বাড়ির খ্যাপা। কালো শিলপাটার মতো চেহারা, খ্যাপা বলে কী যেন গোলমাল আছে চেহারায়। সে সব সময় একটা ধুতি পরে থাকে, তেমন ময়লা নয়, ক্ষারে কাচা। ধুতির অল্প একটা খুঁট পরে সে লজ্জা ঢাকে, বাকি সবটাই কোমরে আলগা করে জড়িয়ে রাখে। সে জন্য কাছাটা টেনে খুলে দিলেই সে প্রায় ন্যাংটো হয়ে যায়। তখন কী যে চেষ্টা তার কাপড়টা পরে থাকার, খসে-পড়া কাপড় সে কাঁচুমাঁচু করে ফের পরতে যায়, কিন্তু একটি হাত তার নুলো, সে হাতটা সরু আর লাঠির মতো সোজা, ভাঁজ করাই যায় না, আর মুঠোটা জন্ম থেকে বন্ধ, শুধু তর্জনীটা শক্ত হয়ে বেরিয়ে আছে। ধুতিটা পরে কী করে বেচারা! সে শুধু তাড়াতাড়ি হেঁটে সামনে যাবার চেষ্টা করে আর মুখে আধো আধো কথায়, অমন করো না গো, উঁহু অমন করো না, উঁ হু হু মা, এঃ এই, ই কী করে—বলে বারবার মিনতি করতে থাকে। আমরা তার পিছু ছাড়ি না, ধুলো ছিটিয়ে দিই গায়ে, থুথু ফেলি আর কাছা ধরে টান মারি। যখন সে কিছুতেই ঠেকাতে পারে না, তখন মরিয়া হয়ে লালা-ভরা মুখে বড় বড় দাঁত কিড়মিড় করতে করতে নিজের ডান হাতটা কামড়ে রক্ত বের করে ফেলে। অন্যকে আঘাত করতে সে কোনো দিন শেখেনি। নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠলে নিজেকে নিজে আঘাত করত। কোনো দিন কাঁদত না, হাসত-ও না অবশ্য, রাগও করত না, নিজের হাতটাই শুধু কামড়ে কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলত।

খ্যাপা নিজের বাড়িতে খুব কমই থাকে। মল্লিক আর শেখদের জোড়া দহলিজের একটায় গরু-মোষের ছানি, গাদা করা খড়ের কুটো এসবের মধ্যে একা বসে থাকে সে। মুখে কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই, বরং একটু হাসি হাসি ভাব। তবুও কেমন মনমরা দুখী দুখী মনে হয় তাকে। একবার খালি শুধনোর অপেক্ষা, খ্যাপা কেমন আছিস? অমনি লালা-ভরা মুখে বড় বড় হলুদ দাঁত বের করে সে সাথে সাথে জবাব দেবে, ভালো আছি গো! খ্যাপা খেয়েছিস? না, খাই নাই। মা সকালে খেতে দেয় নাই? হ্যাঁ দিয়েছে। পেট ভরে নাই? খ্যাপা চুপ করে থাকবে। কিছু খাবি? তবুও খ্যাপা চুপ করে থাকবে। এই নে, পেয়ারা খা। পেয়ারা সে হাত পেতে নেবে না। হাতে দিলে কিন্তু সাথে সাথে চোখ-মুখে কী যে খুশি তার, চক চক করে উঠবে চোখ আর এই বিরাট হাঁ করে একবারে আদ্দেকটা পেয়ারা মুখে দিয়ে হাঙরের মতো গিলতে থাকবে, লালা গড়িয়ে বুক বেয়ে নামবে। বাপ রে, এত খিদে তার! কিন্তু কোনো দিন চেয়ে খাবে না।

মুসলমান পাড়ার উঠতি বয়সের মেয়েরা বোধহয় তাকে নিয়ে খুব বদমাইশি করত। বড়রা বলত। একদিন দেখেছিলাম মল্লিকদের দহলিজে এক গাদা রাখাল-বাগাল তাকে ঘিরে আছে। কী যে খারাপ খারাপ কথা বলছে তারা! একজন বলছে, খ্যাপা, তোর গাল কামড়ে দিয়েছে ক্যা? নেড়ী, কেরিমা না জেলেহার! খ্যাপার গালে, ঠোঁটে, চুলে আলতা মাখানো, পায়েও আলতা লেপা আর খুলে-পরা ধুতির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার নাভির নিচের কালো করকরে চুলের দঙ্গল এবড়োখেবড়ো করে কামানো।

গাঁয়ের রাখালরা হুল্লোড় করছে, হাসছে, মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে আর খুব নোংরা নোংরা কথা বলছে, ওরে বাবা রে, মরে যাব রে, ক্ষুর দিয়ে কেটেছে? যাঃ, ক্ষুর নয়, বেলেট বেলেট—এই খ্যাপা আর কী কী করেছিল তোর?

ওখান থেকে চলে আসার সময় দেখেছিলাম, খ্যাপা তার ডান হাতটা কামড়ে কামড়ে দগদগে ঘা করে ফেলেছে।

এর পরে গাঁয়ে যে একজন আধ-খ্যাপা ছিল তার কথা বলতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না। তার নাম ছিল এহিয়া, সবাই তাকে বলত হেরি খ্যাপা। সে ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। আবলুশের মতো কালো। ভিন গাঁয়ে বাড়ি, তার বাপ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের গাঁয়ে মামার বাড়িতে থাকত। খেলার জন্য ডাকতে গেলেই তাদের বাড়ির কালো বিরাট একটা দিশি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বাঘের মতো তাড়া করে আসত আর সে থামতেই তার নানি খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠত, ওই এল, সব্বোনাশ করে ছাড়বে আমার লাতিনের। নিজের তো ল্যাখা-পড়ার নাম নাই, আমার এহিয়াকেও এক দণ্ড বই নিয়ে থাকতে দেবে না।

এহিয়া অক্ষর শিখতেই পারল না। ময়রার দোকানে সেই দিন সের দুয়েক বাসি জিলিপি ছিল। এক কথায় দুকথায় সে বাজি ধরে বলল সব জিলিপি সে একাই খেতে পারবে। খাবারের দিকে খুব লোভ ছিল। বাসি জিলিপি সব সে খেল আর ঠিক পরের দিন বমি-পায়খানা করে মরে গেল। আধ-খ্যাপার কথা এই জন্য আমি বলতে চাইনি। তার চেয়ে অনেক ভালো গল্প ছিল তার মামাতো ভাই রশিদের। সে শুগুনির মাঠের এ্যারোড্রোম থেকে মার্কিন গোরা সৈন্যদের ব্যবহৃত ব্যাটারি আর ফিউজ বালব এনে আমাদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত আর ব্যাটারির রাংতার খোল গলিয়ে রাংতা বের করে সেই রাংতাকে সিসে বলে আমাদের কাছে এক পয়সা দু পয়সায় বেচত।

কুক্ষণে আমার জন্য একটা নিকার-বোকার কেনা হয়েছিল। কী যন্ত্রণা যে পেয়েছি ওটা পরতে আর কত মারধরই যে জুটেছে ওই বিচ্ছিরি পোশাকটার জন্য! নিকার-বোকারের সাথে কেনা হয়েছিল বাছুরের চামড়ার লাল-রঙের এক জোড়া চমৎকার জুতো। ওটাও অলক্ষুণে। ওর প্রধান দোষ ছিল, আমি বড় হচ্ছি কিন্তু ও বড় হচ্ছে না। পোশাকটাও তাই। চমৎকার কাপড়, তার চেয়েও চমৎকার কাঁধের ওপর দিয়ে পরবার ফিতে জোড়া। সেটা অবশ্য বড় না হলেও অসুবিধা ছিল না, টানলেই বাড়ত। প্যান্ট আর জুতোর তো তা হবার উপায় ছিল না। অবশ্য তেমন দরকার না হলে জুতো পরতই বা কে? জুতোর তলার চেয়ে আমার পায়ের তলা কম মজবুত ছিল না। পায়ের তলায় কাঁটা ফুটবে কি পটাস করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেত। গাঁয়ের চারপাশে মাঠে ঘাটে পুকুরের পাড়ে, পড়ো পগারে বাবলাগাছের ছড়াছড়ি। ফণিমনসার কাঁটা, কৎবেল গাছে কাঁটা, বেলগাছে কাঁটা, বৈঁচিগাছে শিকরে পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা কাঁটা, কুলঝোপে কাঁটা—কাঁটা এড়িয়ে চলার উপায়ও নেই, দরকারও নেই। জুতো-টুতোরই বা কী দরকার। আলাদা ঝক্কি। তার চেয়ে পায়ের পাতা দুটোকেই জুতো বানিয়ে নিলে হয়! আমার পায়ের তলায় শুকনো শামুক কুড়মুড় করে ভাঙত, পুরোনো বাবলা কাঁটা পুটুস শব্দে দু খণ্ড হয়ে যেত। অবশ্য নতুন ঝরা কাঁটা বাবলার আঠা জোগাড় করতে গিয়ে কিংবা এমনি ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে সাই-বাবলা, গুয়ে-বাবলার ছোরার মতো কাঁটা কখনো কখনো পায়ে ফুটে যেত বৈকি! সে জন্য সপ্তাহে একদিন করে ছুঁচ চিমটে এইসব নিয়ে কাঁটা তুলতে বসতে হতো। কবে থেকে সব ঢুকে আছে, পুঁজ হয়েছিল, গা না করায় সে পুঁজ আবার শুকিয়েও গিয়েছে। যেখানে সেখানে মাংস শক্ত হয়ে আছে। ওগুলো সব ছুঁচ দিয়ে খুঁটে খুঁটেই তুলে দেওয়া যেত। তবে এক-আধটা বড্ড ভোগাত। একেবারে মাংসের তলায় গিয়ে বসে আছে। ছুঁচ দিয়ে অনেকটা খুঁড়লে তবে পুঁজের থলিটা মিলত। গল গল করে বেরিয়ে এল পুঁজ, সাথে বেরিয়ে আসত লাল হয়ে যাওয়া কাঁটাটা। কাঁটা না উঠলে তখন চিমটে দিয়ে টেনে বের করতে হতো।

জুতো আমি পরতাম না। তার একটা কারণ, জুতো হিশেবমতো কেনাই হতো না গাঁয়ের ছেলেদের জন্য। চলই ছিল না। দুই নম্বর কারণটা হচ্ছে, জুতো বড় হচ্ছে না। সে তো জুতোর দোষ! জুতোর দোষেই জুতো পায়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য একটু জোর-জবরদস্তি করলে জুতোর বাবা কথা শুনবে। জুতোর বাবাকে সারা বছর শান্তিতে থাকতে দিলেও চলে বটে তবে একটা দুটো দিন যে জুতোর পুত্রকে কথা শুনতেই হবে। এ রকম দু-একটি দিনের একটি দিন হলো বছরের নবান্নের দিন। ওই দিন ননু কাকার বাড়িতে দুপুরের ভোজে নেমন্তন্ন। সেই দিনই প্রথম নতুন চালের ভাতের সঙ্গে ফুলকপির তরকারি খাওয়া হবে, পাকা রুইয়ের ঝাল খাওয়া হবে, সেই দিনই খাওয়া হবে পোস্তর বড়িভাজা, নারকেল ভাজা, অম্বল, চাটনি, আচার, দই মিষ্টি সন্দেশ, নাঃ, নাম বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু শর্ত একটিই : ওই নিকার-বোকার আর জুতো জোড়া পরতেই হবে। আমার বাবা ওই দিন জুতোর বাবাকে দেখে নেন এক হাত আর আমি তার অনেকটাই ভাগ পাই। যা ভাগে পড়ে তার চেয়ে বেশিই পাই। পেটে খেলে পিঠে সয় বারবার এই কথা মনে করেও আমার সয় না, সয় না।

সেই দিন সকালের দিকেই একবার যন্ত্রণাভোগ হয়ে গিয়েছে। বছরের ওই এক দিনই বাবা নিজের হাতে স্নান করিয়ে দেন, অন্য কখনো ছুঁয়েই দেখেন না। মাথায় সাবান মাখিয়ে আদেশ দেন চোখ বন্ধ রাখতে আর চোখ বন্ধ করার

সঙ্গে সঙ্গে আমার দমও বন্ধ হয়ে আসে। এই রোগ আমার আজ পর্যন্ত যায়নি। খুব অন্ধকারে কিছুই না দেখে থাকতে পারি কিন্তু চোখ বন্ধ করে দুনিয়া না দেখার সাথে সাথে দমও বন্ধ হয়ে আসে। খোলা চোখে সাবানের ফেনা লাগলে জ্বালা করবে বলেই চোখ বন্ধ রাখতে বলা সে আমি জানি। বাবা বলেন, বুজেছিস? হ্যাঁ। বুজে থাক্, খুলবি না। এই বলে তিনি চুলে সাবান মাখাতে থাকেন, দিঘির ঘাটে বসে আঁজলা আঁজলা পানি নিয়ে শাদা ফেনা তৈরি করেন। যেন অনন্তকাল এই করছেন তিনি। মুহূর্তের জন্য চোখ খুলছি আমি, চিড়বিড় করে জ্বলে উঠছে দুই চোখ, সঙ্গে সঙ্গে বাবা বুঝতে পারছেন। ঠাস করে মাথায় একটি থাপ্পড়, সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ, আমার খুলি অসহ্য হলে, আবার একটি ঠাস। বাবার কাজ আর শেষ হয় না, আশ আর মেটে না, শেষে ধাক্কা দিয়ে পানিতে নামিয়ে দিতে দিতে বলেন, যাঃ বাঁদর, গা ধুতে হবে না, যা।

সকালে এক ঘন্টা সয়েছি এই যন্ত্রণা, এখন আবার পরতে হবে নিকার-বোকার আর চামড়ার জুতো। তাক থেকে নামানোর পর দেখা গেল জুতো আর চামড়ার নেই, হয়ে গেছে কাঠের, কানায় ছুরির মতো ধার। প্যাটরা থেকে ভাঁজ-করা নিকার-বোকার বেরিয়ে এল মূর্তিমান শয়তানের মতো। একবার ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করে দ্যাখ কী করি। আমার বাবা, ভীষণ রাগী, কম কথা, পাতলা ঠোঁট, শ্যামলা রং, হালকা শরীর, এক সাথে দুটো কাজ নিলেন। নিকার-বোকার গায়ে চাপানো মানে আমাকে তার ভেতরে ঢোকানো আর একটানা প্রহার চালিয়ে যাওয়া। প্রথম দিকে হালকা টুকটাক। মাথায় ছোট ছোট চাঁটি। পা-টা বাঁকাচ্ছ কেন, আড়াআড়ি ঢুকবে অ্যাঁ? সোজা কর। আমি সোজা করতে গিয়ে উল্টোদিকে বাঁকা করি, এবারে চাঁটিটা ঠাঁই করে পড়ল মাথায়, সোজা কর, সোজা কর, হতভাগা—মন্তব্যগুলো আস্তে আস্তে চড়তে থাকে, হতভাগা, কোথাকার হতভাগা, গরু গাধা বাঁদর উজবুক—আমি জানি শেষ পর্যন্ত চুয়ার চাষা শুয়র পর্যন্ত পৌঁছুবে আর মাথা ছেড়ে পিঠ, কান পাছায় চড়-চাপড় চলতে থাকবে। অসম্ভব নয় যে ঘরের কোণে রাখা মোটা বেতটাও নিয়ে আসতে পারেন।

কপাল ভালো প্যান্টালুনটা কোনোরকমে পরা হয়েছে। হাঁটুর নিচে টেনে টেনে নামাতে গিয়ে ওই চামড়ার মতো তাঁবুর কাপড় দু-একবার আটকে গেলে আরও দু-একবার, কেন কেন, এই রকম করে পা-টা ঢোকাতে কী হয়েছে তোমার, অ্যাঁ, চড়িয়ে দেব ইত্যাদি হয়েছে বটে, তবু শেষ পর্যন্ত পরা হলো প্যান্টালুনা। কোমরে না কুলোলেও কাঁধের ওপর দিয়ে ফিতে জোড়া আছে তো, খসে পড়বে না। এইবার জামাটা। তিনিও আঁটি-গুটি হয়ে এমন দাঁত চেপে চিপটে মেরে আছেন যে কার সাধ্যি তার ভেতরে ঢোকে। লড়াই চলতে লাগল, সঙ্গে অনুপান তো আছেই, কোনো দরকার নেই নেমন্তন্ন খাবার। ওবাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ, যেমন চাষা—এসবের পরেও শেষ পর্যন্ত হলো নিকার-বোকার পরা। এবার জুতো জোড়া! সে দুটি পাশেই কাঁধ উঁচিয়ে ঘুমিয়ে আছে, এস জাদু একবার কাছে।

বাবা মেঝেয় ঠুকে ঠুকে কবার জুতোর ধুলো ঝাড়েন। এক গাদা ধুলো আর একটা আরশোলা বেরিয়ে আসে। অবস্থা দেখে বাবাও বোধহয় একটু সন্দেহ সন্দেহ করেন এ দুটো শেষ পর্যন্ত পায়ে ঢোকানো যাবে কি না। আগে থেকেই তিনি হাতে নিয়েছেন এনামেলের তৈরি ওই যে কী যেন বলে শু হর্ন নাকি—সেটা ডান পায়ের জুতোটার গোড়ালির কাছে ঢুকিয়ে আমাকে ডাকেন, আয়, আলগোছে পা-টা ঢোকা। আমি আলগোছেই ঢোকাই। আলগোছে মানে কী, একদম না ঢোকালেই আরও ভালো। ব্যস, আবার শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি, জুতোতে, বাবাতে, আমাতে, ওই হাতলটাতে। এ কি চুয়ারের পা হয়েছে রে, মাঝে মাঝে জুতো জোড়া পরতে তোমার কী হয় হতভাগা? রাত-দিন মাঠে, ঘাটে আচোটা জমিতে টইটই করে ঘুরে বেড়াস। পায়ের ওই ছিরি হবে না? আবার পা ব্যাঁকায়? আরে, গোড়ালি পরে ঢোকাবি, আগে আঙুলগুলো নিচু করে ভেতরে নিয়ে যা, তারপর গোড়ালি একটু তুলে ঢোকাবি?

কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আবার সেই তিরিক্ষি মেজাজ, চড়-থাপ্পড়, কান ধরে টানা আর শেষ পর্যন্ত যাঃ, কোথাও যেতে হবে না, নেমন্তন্ন বন্ধ, বাড়িতেও দুপুরের খাবার বন্ধ। বলেন বটে কিন্তু ছাড়েন না। কোনো কিছুই ছেড়ে দেবার মানুষ তিনি নন। আমি কখনো কিছুতে কাঁদি না, কান্নাটা একদম সহ্য করতে পারেন না বাবা। কাঁদা কী? কাঁদলেই তাঁর রাগ বাড়ে। মার খেয়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদি না বটে তবে অপমান আর লাঞ্ছনা বেশি হলে কখনো কখনো মনের দুঃখে কেঁদে ফেলি আর সেই কান্না থামানোর জন্য আবার মার খাই।

যাই হোক, এইটুকু মনে আছে, চোখের জলে নাকের জলে হলো, কান জোড়া লাল হলো, নাকের ডগা ফুলে গেল আর শেষ পর্যন্ত বেয়াড়া ঘোড়া কেমন করে লাগাম পরে চুপ করে দাঁড়িয়ে লাগামের লোহার কড়া চিবোয়, আমিও তেমনি নিকার-বোকার, ফিতে-বাঁধা জুতো এসব পরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। পোশাক-আশাক এমন করে কামড়ে ধরেছে যেন আমি শূন্যে ভাসছি। তবু তো নেমন্তন্নে যাওয়া হবে শেষ পর্যন্ত।

দুটো পাশাপাশি দিঘির একটির পাড়ে উঠব—সেখানে পাশাপাশিই দুটি বিরাট গাছ—ঘাটের পাশেই হাতির শুঁড় আর অজগরের মতো শিকড় ছড়িয়ে পড়েছে। নিচে ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতো উঠে গেছি আর ঠিক তিন নম্বর সিঁড়ির বাঁ পাশে একটি শিকড়ের গা ঘেঁষে আছে সেই নীলফুলের গাছটা। কল্কে ফুলের গাছের মতো বড় কেমন নারকেল-কোরা সরু করে কাটা সুপারির মতো জিরিজিরি পাতা। সারা গায়ে কাঁটা কাঁটা মতো, কিন্তু কাঁটা নয়। এই গাছ আমি আবিষ্কার করেছি। এর কথা কেউ যখন আমাকে আগে বলেনি, তাহলে আমিই! সারা গাঁয়ে এই গাছ আর কোথাও নেই, আসলে সারা দুনিয়াতেই নেই। আমার জন্য নীল ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই গাছ যেন অন্য জগৎ থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে এখানে। গোটাগুটি গাছটাই, কারণ আমি তাকে ছোট চারাগাছ থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে দেখিনি। নীল ফুল তারার মতো, তারার চেয়ে একটু বড়, ছোট ছোট কত পাপড়ি তার ঠিক নেই আর গন্ধ শুঁকলেই মনে হয় একদম মায়ের কোলে। কতবার দেখতে যাই একা একা। ঘন ঘন যাই না। তাহলে দেখতে পাব, দেখতে পাব মনে করে যে আনন্দ পাই, সেটা যে পাব না। এখন নেমন্তন্ন খেতে ভাইবোনদের সঙ্গে যেতে যেতে দেখব। দেখে পাশ দিয়ে চলে যাব, কাউকে কিছুই বলব না।

বাবা এমনিতে আমাদের দিকে চেয়েও দেখেন না। বড় হচ্ছি যেন বাড়ির কোণে ফেলে দেওয়া আঁটি থেকে জন্মানো আমের চারা। আলো হাওয়া রোদ বৃষ্টি পাচ্ছি এই যথেষ্ট। হতে পারে বাবা বোধহয় ভাবেন, মাটিই যথেষ্ট, বড় হতে যা যা লাগে সব সেখানে আছে। তিনি আমাদের দেখেন না, দেখেন না, হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল কড়া গলায় বললেন, চুল হয়েছে তো বাউরিদের মতো। যা, খেলা নাপিতকে ডেকে নিয়ে আয়, বলবি, বাবা ডাকছে, ক্ষুর কাঁচি নিয়ে চলে আসুক।

গাঁয়ে নাপিত আছে দুই ঘর। বলতে গেলে এক ঘর। সেইটাকেই আমরা বলি নাপিত বাড়ি। তাদের বছরের সিধে পাওনা থাকে। নগদও কিছু দেওয়া হয়। সেই বাড়ির কর্তা দেবেন কাকা। সবাই বলে দেবেন খোঁড়া, চার হাত-পায়ে চলেন হামাগুড়ি দিয়ে। পা দুখানি সরু কাঠি কাঠি, পাছা কোমরও এইটুকুনি, কিন্তু কোমরের ওপর থেকে বিরাট পুরুষ। খাঁজ-কাটা খাঁজ-কাটা পেট, চওড়া বুক, শালগাছের গুঁড়ির মতো বিশাল দুই হাত। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, হাসিও নেই মুখে। ওপরের পাটির দাঁত শুধু উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে তাই নয়, একটা দাঁত আবার একদেঁতো হাতির মতো মুখের অনেকটা বাইরে চলে এসেছে। ডাকতে গেলে বাড়ির ভেতরের উঠোন থেকে চার হাত-পায়ে এগিয়ে আসতেন। নাচ দুয়োর পেরিয়ে যে দুটি ছোট ছোট রোয়াকের মতো করা আছে, তার একটিতে উঠে বসতেন। ঠিক যেন গাছে বীর হনুমান বসে আছে। দেবেন কাকা নিজে কখনো নাপিতের কাজ করতেন না। করত তাঁর দুই ছেলে পাগল আর সুবল। সুবল কম, চাষবাসের কাজেই থাকত সে বেশি। পাগলই নাপিতের কাজ করত সারা গাঁয়ে। তার আবার খুব মেজাজ, খুব ব্যক্তিত্ব, চুল কেটে দিচ্ছে, না দয়া করছে।

দেবেন কাকা বাবার খুব বন্ধু। গাঁয়ে বাবার তিন-চারজন বন্ধুর মধ্যে একজন। বাড়িতে না থাকলে গাঁয়ের দু-তিন জায়গায় খুঁজলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে নাপিত বাড়ি হচ্ছে এক নম্বর।

তখন বোধহয় কী একটা কারণে পাগলা নাপিত আমাদের বাড়িতে আসছিল না। সে জন্যই বাবা খেলা নাপিতকে ডেকে আনতে বলেছিলেন। খেলাদা নাপিতই নয়, যা-তা চুল কাটে, যেখানে-সেখানে কাঁচি চালিয়ে চুল এবড়োখেবড়ো করে দেয়। বাবা বলেন, ই কী বেগুনের ভিলি করেছিস রে। সমান কর, সমান কর। এখন সমান করতে গেলে চুল ছোট হয়ে যাবে যে! আরে না, কী চুল কেটেছিস, খ্যাপা-খ্যাপা লাগছে ছেলেটাকে। সমান করে দে। ব্যস, সমান করতে গিয়ে খেলাদা দিলে আমাকে কদমছাঁট করে।

আজ আবার সেই খেলাদাকেই ডাকতে হচ্ছে। তাদের দক্ষিণমুখো নতুন ছাওয়া একঘরের মাটির বাড়ি আছে একটি। বিরাট উঠোন, ঘাসে-ভরা, মনে হয় বাড়িতে কেউ থাকে না। থাকেও না বোধহয় তেমন কেউ। খেলাদার ন্যাড়া মাথা বুড়ি মাকে দেখি কখনো কখনো। খেলাদার বউ বোধহয় বড়লোকের মেয়ে, না হলে খেলাদাকে পছন্দ করে না, সে প্রায় বাপের বাড়িতেই থাকে। দেয়ালঘেরা বাড়ি, এত নির্জন আর এমন চুপচাপ যে খেলাদাকে চেঁচিয়ে ডাকতে ইচ্ছে করে না। আস্তে আস্তে বার দুই-তিন ডেকে আচমকা চেঁচিয়ে উঠি আমি, এই খেলাদা, বাড়িতে আছ না, নেই? এইবার চোখ কচলাতে কচলাতে অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে খেলাদা। খালি গা, হাড় জিরজিরে খেঁকুটে চেহারা, ফর্সা গায়ে গাদা গাদা তিল। সে বেরিয়ে আসতেই বলি, বাবা তোমাকে ডাকছে। আমার চুল কাটতে হবে। চলো। আধবোজা চোখে খেলাদা আমাকে বলে, বাবাকে যেয়ে বলো, আমি আজ একটু মদ খেয়েছি। এখন তেনার সামনে যেতে পারব না। বাঁচা গেল, চুল কাটা তাহলে হবে না! খেলাদার চুল-ছাঁটা মাথা কারও সামনে দেখাতে পারি না। আমি ভীষণ খুশি। বলি, তাহলে বাবাকে গিয়ে বলি, তুমি এখন মদ খেয়ে শুয়ে আছ, আসতে পারবে না। বাপ রে, মদ খেয়েছি বললে পণ্ডিত'শাই আমাকে গাঁ থেকে বার করে দেবে। তুমি গিয়ে বলো গা, খেলাদা জ্বরে বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে,

কিছুতেই আসতে পারবে না। লক্ষ্মী দাদা আমার!

খেলাদার হাত থেকে নাহয় বাঁচা গেল কিন্তু বন শুয়রের মতো একমাথা চুল নিয়ে আর কদিন থাকা যাবে! শেষ পর্যন্ত পাগলা নাপিত একদিন বেলা এগারোটার দিকে এসে খামারবাড়ির এক কোণে পাশের কোঠাবাড়ির ছায়ায় বসিয়ে আমার চুল কাটতে লেগে গেল। খড়ের চালের খুব ঘন ছায়া হয়। এদিকে বাইরের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর। জনপ্রাণী নেই আশপাশে। আমরা খড়ের চালের ঠান্ডা ছায়ায় বসে আছি। মাঝে মাঝে হুশ করে ধুলোভরা বাতাস আসছে, দূরে পাকুড়গাছ থেকে সেই বাতাসের ঝম ঝম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু পাগলা নাপিত কঠিন রাগ রাগ মুখ করে দাঁত চেপে বারে বারে আমার মাথাটা তার ময়লা ধুতি পরা দই উরুর মাঝখানে গুঁজে দিচ্ছে। আমার খুব উমুড়ি-গুমুড়ি লাগছে, হাঁপু-চুপু করছি—ওই মাথায় সাবান মাখিয়ে দিলে যেমন হয়—আমি মাথা সরিয়ে আনতে চাই আর পাগলদা আঃ বলে ফের ঠেসে ধরে দুই উরুর মাঝখানে। একটা লোহার চেয়ারে বসে বাবা দেখছেন। তাঁর আবার সায় পাগল নাপিতের দিকেই। চুল্‌বুল্‌ করছিস কেন, বোস্‌ না একটু স্থির হয়ে।

চুল কাটা হয়ে গেলে না আবার সাবান মাখতে হয়, বাবা না আবার চান করিয়ে চুল আঁচড়ে দেন। এই আরেক যন্ত্রণা, বাবার চুল আঁচড়ানো! আদর বলতে ওইটুকুই, মাঝে মাঝে ধরে চুল আঁচড়ে দেওয়া। তাতেও আবার প্রায়ই দু-একটা চড় থাপ্পড় খেতে হয়। বাঁ হাতে চিবুক ধরে ডান হাতে কাঁকুই দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন। মাথা নড়াবি না, ঠিক এই রকম করে থাক, আবার নড়ে—ছোট্ট একটা চড়। কবে বড় হব, কত দিন চলবে এসব?

চুল কাটা চলছে। প্রথমে খানিকক্ষণ খ্যাঁচ খ্যাঁচ কাঁচি চালিয়ে চুলের জঙ্গল সাফ করে দেওয়া হলো। তারপর শুরু হলো কিট কিট কিট কিট, ক্লাপ ক্লাপ ক্লাপ, ঠক ঠক। ভাবছি কতক্ষণ চলবে এসব, কত কাল! এদিক-ওদিক তাকানো যাচ্ছে না। আর বাবা মাঝে মাঝে উঁহুহু—কানের কাছে এক থোপা চুল রয়ে গেল—এই যে এইখানে! কিট কিট থামিয়ে ক্ষুর বের করতে গেলে, না না, ছেঁচে দিস না। এদিকে এমন করে ঘাড় আমার বাঁকানো যে কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, শুধু চোখের কোণে দহলিজে টাঙানো একটা বাংলা ক্যালেন্ডারে দেখতে পাচ্ছি ১৩৫৩ ঘুরেফিরে খালি ১৩৫৩, ১৩৫৩ আর একটা বুড়ো গাছতলায় বসে দুটো ছাগল চরাচ্ছে। মাঠে খুব ঘাস! ক্যালেন্ডারের মাঠে।

আমাদের গাঁয়ে কুমোর নেই, ছুতোর নেই। ধোপাবাড়িও নেই। কামারবাড়ি আছে দুটি। সত্যি বলতে কি দুটি নয়, একটিই। খেলাদা যেমন নাপিত হয়েও নাপিত নয়, ভালো নাপিত তো নয়ই। বাসু কামারও তেমনি কামার হয়েও কামার নয়। তার বয়স কম, খুব নেশা করে, গাঁজা-গুলি খায়। মদও খায় কিন্তু তাড়ি খায় না। মজার ব্যাপার গাঁজা আর তাড়ি দুটাই খায় মুসলমানরা, হিন্দুরা অনেকে গাঁজা খেলেও তাড়ি কেউ খায় না। কেন খায় না জানি না। তবে মদ অনেকেই খায়। নিজেরা তৈরি করে না, যাদের বলে নীচু জাত সেই মুচি-বাগদি বাউরিদের কাছ থেকে নিয়ে আসে।

বাসুদার বাড়ির কিছু ছিরিছাঁদ নেই। তার বাপ নেই জানি, মা বউ ছেলেমেয়ে আছে কি না জানি না। বাড়ির পেছন দিকে খোলা জায়গায় কামারশালা একটা আছে বটে, কিন্তু সেখানে হাঁপর চলে না। প্রায় সব সময়ই নেভানো থাকে। চারপাশে টুকরো-টুকরো লোহা, কাঠ-কয়লা, ছাই, কাছের যন্ত্রপাতি সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বাইরে খোলা জায়গাটা আগাছায় ভরা। একপাশে ছাই গাদা আর যেখানে-সেখানে বাবলাগাছের ছাল-ছাড়ানো গুঁড়ি, আধা-তৈরি গরুর গাড়ির চাকা, লাঙল, মরচে-ধরা ফাল। রোদে শুকোচ্ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে বাসু কামারের দেখা নেই। কামারের কাজ করতে তাকে দেখা যেত বটে, তবে সে কাজ কামারশালে বসে হাঁপর টানা নয়। পাশের গাঁ ক্ষীর গাঁয়ে যোগাদ্যাপুজোর মেলার প্রথম দিনে যে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে পাঁঠা বলি হয়, সেই দিন নিশ্চয় দেখতে পাওয়া যাবে বাসুদাকে। মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে, দু চোখ টকটকে লাল, কপালে সিঁদুর লেপা। খালি গা বেয়ে জল গড়াচ্ছে। হাতে তার সিঁদুর লেপা এক বিরাট খাঁড়া। যাদের পাঁঠা মানত আছে, তারা এক একটা পাঁঠা ক্ষীরদিঘির জলে ছুড়ে দিচ্ছে, তুলে আনছে। পাঁঠাটা বার দুয়েক ভগ ভগ করতে করতেই তাকে হাড়িকাঠে ফেলছে আর বাসু কামার এক কোপে মুণ্ড নামিয়ে দিচ্ছে। তখন একবারও মনে হয় না বাসু কামার কাউকে চেনে কিংবা মানুষের সঙ্গে কোনো দিন কথা বলে বা তার ছেলেমেয়ে বউ কেউ আছে। বোশেখ মাসের কড়া রোদে কী তার মূর্তি! এর ওপর যে দিন যোগাদ্যার আসর বলি মোষ বলির দুপুরের 'খ্যান' আসত সেই দিন কার সাধ্যি বাসু কামারের সঙ্গে একটা কথা বলে।

কাছ থেকে মোষ বলি আমি একবারও দেখতে পেলাম না। পাহাড়ের মতো উঁচু টিলায় ছোট্ট মন্দিরটার চাতালে বিশাল হাড়িকাঠ বেশ উঁচু করেই পোঁতা হতো। সেটা ঘিরে মানুষের ভিড় যেন ঠিক একটা পাঁচিল বা পাথরের চাঙর। কোথাও একটু চিড় কি একটু ফাটল নেই যে ভেতরে ঢোকা যায়! খানিকটা দূর থেকে দেখি বাচ্চা একটা মোষের মাথা উঁচু হয়ে আছে। কারা টেনে ধরেছে কে জানে, মোষের ঘাড়টা মোটা রশির মতো টান টান হয়ে রয়েছে। তারপর আর কিছুই দেখা গেল না, শুধু একবার কোনোরকমে দেখা গেল বাসু কামারের সিঁদুর-মাখা খাঁড়াখানা ওপরে উঠল আর নামল, মোষের মুণ্ডুটাও টুপ করে নিচে পড়ল।

বাসু কামারের কাজ বলতে এই। এ ছাড়া আর একটিমাত্র কাজ সে করত। তবে কামারের কাজের সঙ্গে তা মোটেই মেলে না। বাসুদা গাঁয়ের শখের যাত্রার দলে বিবেকের গান গাইত। হ্যাঁ, তখন দেখা যায়, খাশা চেহারা তো বাসু কামারের! গুলিখোর গাঁজাখোর মদো সেই বাসু কামার কোথায় গেল? কালো হিলহিলে, কোমর-সরু চওড়া বুক হাসিমুখো বাসুদা সাঁঝবেলায় পালপাড়া যাচ্ছে যাত্রার রিহার্সেলে। তখন হেমন্তকালে কিংবা শীতকালে—গরুর গোয়ালের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী হয়ে পথের ওপরেই নড়ছে-চড়ছে, থমকে আছে। একটু রাত হলে কত দূর থেকে বাড়িতে বসে তার দরাজ গলা শুনছি। যেমন ভরাট আওয়াজ, তেমনিই মিঠে আর সুরেলা। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে প্রত্যেকটা কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে। একই সুর, কত উঁচুতে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার মতো তর তর করে নিচে নেমে আসছে। রিহার্সেল যত দিন ধরেই হোক, একদিন না একদিন শিবতলার উঁচু উঠোনে যাত্রা তো হতেই হবে। আসরের মাথায় চাঁদোয়া টাঙানো থাকবে। ওর তলাতেই গান অভিনয়। ওখানেই সিংহাসন, রাজসভা, রাজা-রানীর শোবার ঘর। ওইখানেই বন-জঙ্গল, যা চাই সব। মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, লখিন্দরের লোহার বাসরঘর, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পাটলিপুত্র নগরী—সব, সব ওইখানে। চারদিকে ডে-লাইট আর হ্যাজাক লণ্ঠন ঝুলানো, আলোয় আলোময়। আরও আছে শাদা কারবাইডের আলো। গাঁয়ের সব মানুষ আসরের চারপাশ গিলে খোলা আকাশের তলায় মাটির ওপর বসে আছে। মেয়েরা বসেছে পুব দিকে তিন শিবমন্দিরের লম্বা বারান্দায় আর পাঁচ ধাপ টানা সিঁড়িতে। একটা আমকাঠের চেয়ারের সিংহাসনে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বসে আছে আর তার সামনে ছোকরা দুর্যোধন হাত-পা নাড়িয়ে আস্ফালন করছে। এমন সময় বিবেকের গেরুয়া ধুতি পরে গান গাইতে গাইতে বাসুদা মানুষের গলি দিয়ে এসে আসরে ঢুকল। সে কী গান, গম গম করছে গোটা আসরটা। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঘাড় নামিয়ে বসে আছে, দুর্যোধন নেচেকুঁদে একাকার। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী—এই সব বলছে আর বাসুদা একবার এক হাত বাড়িয়ে, একবার দুহাত ছড়িয়ে বিধির বিধান দিয়ে যাচ্ছে, সত্যের জয় হবে, পাপীর পতন হবে। এখনো সময় আছে, সাবধান হ', সাবধান হ'। ধৃতরাষ্ট্রের মুখের কাছে গিয়ে মুখ নেড়ে নেড়ে গাইছে, দুর্যোধনের থুতনি নেড়ে দিচ্ছে। এমনি করে গাইতে গাইতে বাসুদা আসর থেকে বেরিয়ে গেল। ভাব দেখে মনে হলো ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধন শুধু গানই শুনেছে, বাসুকে দেখতেই পায়নি।

গাঁয়ে তাহলে কামারের কাজগুলো করত কে? সে জন্য ছিল একটিই কামারবাড়ি। সেই বাড়ির কর্তা কণ্ঠ কামার আর তার ছেলে কার্তিক কামার। ওই বাড়ির কামারশালার আগুন কখনোই নিভত না। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দারের মতো রোগা প্যাকাটি চেহারা কণ্ঠ কামারের, কিন্তু বিরাট এক জোড়া পুরুষ্টু কাঁচাপাকা টাঙি গোঁফ তার। কণ্ঠ কামার যে কী কালো ভাবা যায় না। তারও গুলিঘোরের মতো পাকানো দড়ির মতো চেহারা, যদিও গুলি সে কোনো দিন খায় না। মনে হয়, হাঁপানি আছে বলেই চেহারা ওই রকম শুকিয়ে দড়ির মতো হয়েছে। পুকুরে স্নান করে শুধুমাত্র একটা পুরোনো গামছা পরে সে যখন বাড়ি ঢুকত, ঠিক যেন একটি শাঁকচুন্নির বুড়ো-হাবড়া ছেলে। কিন্তু ওই কণ্ঠ কামারই যখন তার কামারশালে কাজ করত, আমি কত দিন বসে বসে দেখেছি। ডান হাতের চেটোটা তার বিরাট বড়, আঙুলগুলো সব ট্যারাব্যাঁকা, সোজা হয়ই না। বোধহয় হাতুড়ি ধরে ধরে ওই অবস্থা। সে বাঁ হাতে হাঁপর টানছে আর ডান হাতে এমন করে হাতুড়ি ধরেছে যেন ইচ্ছে করলেও মুঠি খুলতে পারবে না। কাঠকয়লার আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। কণ্ঠ কামারের কালো শরীর পোড়া ইস্পাতের মতো তামাটে-নীলচে হয়ে যাচ্ছে। বঁটি হচ্ছে, কাস্তে হচ্ছে, লাঙলের ঈশ তৈরি হচ্ছে। লোহার এক একটা টুকরো থেকেই ওই সব হচ্ছে। লোহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ কামারও পুড়ছে। পাতলা ফিনফিনে ইস্পাতের একটা পাত হয়ে গিয়েছে তার শরীর।

কামারশালের বাইরে ঘুঁটে কাঠকয়লা এসব দিয়ে আলাদা আগুন তৈরি করে গরুর গাড়ির চাকায় লোহার হাল পরানোর সময় দেখতে হয় এক মজা। কণ্ঠ এক হাতেই সব করছে। চাকার ঘেরের চেয়ে লোহার বেড়িটার ঘের একটু কম, টকটকে লাল বেড়িটাকে চাকার ঘেরে লাগিয়ে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে টেনে একটু বড় করে নেওয়া আর ভারী হাতুড়ি চালিয়ে চাকার ওপর বসিয়ে দেওয়া—কী আশ্চর্যই যে লাগত! ঘণ্টাখানেক বাদে ঠান্ডা হয়ে গেলেই হাল এঁটে বসত চাকায়।

কণ্ঠ কাকার ছেলে কার্তিকের চেহারা আবার ঠিক কার্তিক ঠাকুরের মতোই ফর্সা। একহারা, মাঝারি গড়নের মানুষ সে। কামারের কাজ তেমন করে না। বাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাত লাগায় মাত্র। সে মাঠে জমিতেই কাজ করে বেশি। জমি কম তো বেশি সবারই আছে। অন্য কাজ যে যা-ই করুক না কেন,

সে বাঁ হাতে হাঁপর টানছে আর ডান হাতে এমন করে হাতুড়ি ধরেছে যেন ইচ্ছে করলেও মুঠি খুলতে পারবে না

গরু না হলে মোষের লাঙল, গাড়ি নেই কার? একমাত্র বামুনরা ছাড়া।

এদিকে সারা গাঁয়ের কামারের কাজ বলতে গেলে একা কণ্ঠ কামারকেই করতে হতো। সে মরে গেলে আমাদের বিপদই হলো বৈকি। পাশের গাঁয়ের কামারশালে যেতে হতো অনেককে, যেমন গাঁয়ের কুমোর স্বর্ণকার ধোপা ছিল না বলে অন্য অন্য গাঁয়ে কিংবা বর্ধমান কাটোয়া শহরে গিয়ে ওদেরকে দিয়ে দরকারি কাজগুলো করিয়ে আনতে হতো। দুর্গা ঠাকুর, কালী ঠাকুর, কার্তিক, মনসা, জগদ্ধাত্রী ঠাকুর গড়বে কে? কুমোর আসত গিধগা থেকে। দুর্গা, কালী, গণেশ, কার্তিক এসব ঠাকুর গড়ত তারা। মাথাটা গড়ত ছাঁচে ফেলে। তাতে চোখ ভুরু ঠোঁট এসব আঁকত নরুণের মতো যন্ত্র দিয়ে। তেলীদের গং ছিল এ গাঁয়ের কলুবাড়ির ভাগ্নে। বড় বড় চোখওয়ালা গং মাটির কত কী যে বানাতে শিখেছিল! ঠাকুরও বানাতে পারত সে। তাই বলে তার বানানো ঠাকুর তো আর কেউ নেবে না। সে জন্য এটা-ওটা তৈরি করে গং আমাদের দিত।

একবার আমাকে সে একটা ঝরনা কলম চার আনায় বেচেছিল। ফুফুর হাতে পায়ে ধরে, সারা দিন কেঁদে কেটে ধরনা দিয়ে তবে চার আনা পয়সা পেয়ে গংকে কলমের দাম দিই। ওই আমার জীবনে প্রথম ফাউন্টেন পেন। হাত বুলোই, বুক পকেটে রাখি। বুকের কাছটা কেমন মিষ্টি মিষ্টি গরম লাগে, বারে বারে বের করে দেখি। খুব হালকা সবুজের মধ্যে শাদা ডোরাকাটা। কী যে চমৎকার দেখতে! তার পরই একদিন দেখা গেল বুকের কাছে জামা ভিজে। কলমের মুখের প্যাঁচটা কাটা। পকেটে জেবিডি ব্লু কালির দাগ। বাবার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যেত জামাকাপড়ে ফলের কষ কিংবা কালির দাগ লাগলে। কী করব এখন এই দাগ নিয়ে। এখুনি না হোক, চোখে তার পড়বেই এবং প্রহার অনিবার্য। জামা-কাপড় ছিঁড়লে কিছু যায় আসে না তাঁর, পোশাক পুরোনো হলে তো ছিঁড়বেই। কিন্তু দাগ লাগবে কেন? একমাত্র চোয়ার চাষাই জিনিসের ব্যবহার জানে না। যাই হোক, মার তো খেতেই হবে, এখন গং-এর কলম নিয়ে কী করা যায়? প্যাঁচে কাগজ জড়িয়ে আটকানো হলো, কাগজসুদ্ধ ভিজিয়ে কালি বেরিয়ে আসছে দেখছি। তারপরে লিখতে গিয়ে দেখি নিবের চেরা মুখ কিট কিট করে একটা উপরে উঠছে, সেটা নামছে তো আর একটা উঠছে। গং-এর কলম তাহলে সবাইকে শুধু দেখানোর জন্য থাকল।

গাঁয়ে কুমোর নেই বলে মাটির হাঁড়ি কুঁজো কলসি মালশা এসব তৈজসপত্রও বাইরের হাটবাজার থেকে কিনতে হতো। তেমনি ছুতোর মিস্ত্রি নেই। একমাত্র ছিল হালিমের বাপ আর তার ছেলে হালিম। হাতিয়ার, তারা বলত 'হেতের', তেমন একটা ছিল না তাদের। একটা হিসকাপ, একটা তুরপুন, দুটো করাত। একটা বেঁশেল অবশ্য ছিল। এসব দিয়ে দরজা জানালা সারাই বা ওই রকম টুকটাক কাজ করে দিতে পারত তারা। তার বেশি কিছু করতে গেলেই পাশের গাঁ থেকে ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে আনতে হতো। এর ওপর স্যাকরা ধোপা কটা গাঁয়েই বা ছিল। আমাদের গাঁয়েও ছিল না। শহরে যেতে হতো ওসবের জন্য। ধোপার দরকারটা অবশ্য ছিলই না। সচ্ছলরা সাবান, সাধারণ গৃহস্থ ক্ষার আর গরিবরা সাজিমাটি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিত।

ভারি একঘেয়ে জীবন আমাদের। আজকের দিনটা ঠিক কালকের মতো। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, খেলা-ধুলো প্রত্যেক দিন ঠিক এক রকম। সারা বছরের মধ্যে এক দিনও বড় মাছ রুই কাতলা, মৃগেল জোটে কি না সন্দেহ, গঙ্গার ইলিশ, (কাটোয়ার ভাগীরথী) বড় গলদা চিংড়ি, বিশাল চিতল হচ্ছে গিয়ে স্বপ্নের মাছ। প্রতিদিন দুবেলা খেতে হবে জলের মতো পাতলা কলাইয়ের ডাল, মুগ মুসুরি, ছোলা, আইরি, (অড়হর), মটর, তেওড়া (খেসারি)—এসব কলাইয়ের ডাল ইচ্ছেমতো আর ঘরোয়া শাকসবজি—কলমি, পুঁইশাক, হেলেঞ্চা, ঘাসের ভেতর থেকে বেছে তোলা গাধা পুইনি, কাঁটানটে, তারপর সজনের শাক, আর মাঠে খামারে যত্ন করে লাগানো পালং, পুরকো, পিড়িং, পাটের শাক, লাউশাক, কাটোয়ার ডাঁটা আর সেই সঙ্গে অঢেল আলু, কুমড়ো, চালকুমড়ো, ঝিঙে, পটল, চিচিঙ্গা, উচ্ছে, কাঁকুড়, শসা, করলা। সেই একেবারে যাকে বলে, খাস খাস, কাঁচকলা খাস, খাস খাস বিচিকলা খাস। তেঁতুলের টক খাস, আমড়ার অম্বল খাস, এক আনায় পাঁচ সের বেগুনের ঘ্যাঁট খাস। বিলাসী খাবার পুস্ত, আলুপুস্ত—ভাত আবার তাতে বেশি করে রাঁধতে হবে। বেশি খেলে রাতকানা রোগ হয়। নেশা হয়, ঘুম ঘুম পায়। শুষুনি শাক খেলে যেমন হয়।

হাট একটা বসে শনি মঙ্গলবার দু-দিন এক কোশ পশ্চিমে সেই ছোট লাইনের রেলস্টেশন নিগণে। তবে কাঁচা পয়সা নিয়ে বাজার করতে কজনই যায়? কেরোসিন আর কয়লা আনতেই যায় লোক বেশি। শখ করে নারকেল-টারকেল দু-একটা কেউ কেনে, বরবটি কলাই কেনে আর কেনে ওই

পুস্ত—পপিফুলের বীজ। রান্নার তেল সরষের তেল কাউকে কাউকে কিনতেই হয়। গণেশ মার্কা খাঁটি সরসের তেল বড় বড় মুদিখানায় পাওয়া যায়। গাঁয়ের দু-একটি বড় গৃহস্থ হয়তো কখনো কখনো কিনে আনে। নাহলে গৃহস্থের ঘরেই সরসে হয়। গং-এর মামারা কলু। সেই কলুবাড়িতে অন্ধকার গোয়ালঘরে ঘানি ঘুরছে। চোখে ঠুলিপরা কালো বলদটা ঘানি টানছে। কোঁ কোঁ শব্দে কান ঝালাপালা, ঘরে কোনো লোক নেই, বলদ আপন মনে ঘুরছে। শব্দ শুনেই বোঝা যায় বোকা বলদ ঠিক ঘুরছে, থেমে গেলেই কলুবাড়ির লোকেরা বুঝে যায় ঘানি থেমেছে। সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ গোয়ালে ঢুকে বলদটাকে দুঘা দিয়ে আসে। আবার ঘানি চলে। ঘানির পাটায় বিরাট একটা পাথর চাপানো।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে কিছুই দেখতে পাই না। গং-এর বড় মামাকে বলে ঘানির পাটায় চুপ করে বসি। অন্ধকার ঘরে কটর কটর কোঁ-ও-ও শব্দে ঘানি ঘোরে। সেই সঙ্গে আমিও ঘুরি। বাইরে দিন না রাত, সময় কি চলছে না বন্ধ, তেল ভাঁড়ে এসে পড়ছে কি না কিছুই জানতে পারছি না। কখনো কি ভর্তি হবে ভাঁড়, কখনো কি শেষ হবে বলদটার ঘুরে মরা? ঘানির কাঠের গোল পাত্রে আছে সরষে, ইচ্ছে হলে তিল সিতি (মসিনা) দেওয়া যায়। ওসব তেল তেমন কেউ খায় না। তিসির তেল তো নয়ই।

কিন্তু তাতে কীই-বা আর হবে? এই রোদ-পোড়া, ন্যাড়া উদম খোলা দেশে আর যে কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাতে কিছু কি যাচ্ছে, আসছে? কিছুই না। ঝিঙেশাল, দাদখানি কাটারিভোগ চাল সবাই খায় না—যারা খেতে পারে তারাও না—মোটা দুধ-কলমাই খায়। চড়ুইমুখী, চিনি আতপ, রাঁধুনিপাগল এসব শৌখিন দামি চাল ঘরে যত্ন করে রাখা থাকে। কুটুম এলে, মানি অতিথি এলে, বেয়াই এলে, জামাই এলে পোলাও হয়। মুরগির কোর্মা হয়। অনেক অনেক তিন শ পঁয়ষট্টি দিনের একটি দুটি বিশেষ দিনে। এমনিতে প্রতিদিন মোটা দুধ কলমা চালের ভাত, কলাইয়ের ডাল, শাকপাতা, সবজি দিয়েই পেটপুরে খেয়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে দৌড়ে। বট অশথের ছায়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে দিনের পর দিন পার করায় সুখের কমতিটা কই?

দূর, কোনো রং নেই তাই আবার হয় নাকি! এক এক সময় রাগে পিত্তি জ্বলে যায়। কোথাও কিছু পাওয়ার উপায় নেই। একটা ফল নেই যে চুষি, একটা ফুল পাই না যে তার রং দেখে দেখে খানিকটা সময় কাটাই, কী একটুখানি গন্ধ শুঁকি। এমন খালি ঠনঠনে আমাদের এই দেশ। গাঁয়ের বাইরে এলে সারাটা আকাশের তলা ফাঁকা, কত দূর মাঠের শেষে ঢালু হয়ে আকাশ মাটিতে নেমে পড়েছে—পশ্চিমে এমনি, পুবে এমনি, শুধু উত্তর দক্ষিণে বহু দূরে দু-চারটি গাঁ ঢালু আকাশের গায়ে লেগে আছে। ঠিক যেন স্লেটের গায়ে পেনসিল ঘষা। ধুলো আর ধোঁয়া লেপা, তারই মধ্যে দুপুরবেলায় ঝিম মেরে ঘুমুচ্ছে গাঁগুলো। তখন মনে হয় ধুলো ধুলো ওই যে রং দেখা যাচ্ছে। আকাশের গায়ে আঁকাবাঁকা হয়ে লেগে আছে; দূর, ও রকম রং থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। তারপর ফাল্গুন মাস নাগাদ সব ধান কেটে নেওয়ার পরে, যত দূর চোখ যায় কেবল ধানের নাড়া পড়ে আছে। কোনোদিকে তার যেন শেষ নেই। ধান কাটার পরেই নাড়ার সোনালি রং ছিল, এখন একদম ধুলোটে। সারা মাঠই এখন ধুলোটে। জমির মাটি যেমন ঠিক তেমনি, ছাই ছাই আর মেটে। তারপর খালি হাওয়া আর ধুলো আর ফাঁকা আর উদম আর খোলা। এ সময় আকাশটাও ধুলো-ভরা, তার মধ্যে সূর্য দাঁত কিড়মিড় করছে। মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটি। হাঁটি আর কখনো কখনো দৌড়ুই। কী একঘেয়ে, কী বিচ্ছিরি এক রকম, টানা, একটানা সমান। কোথাও একটু উঁচুনিচু নেই আর কিছুতেই কিছু ঘটে না। এত ফাঁকায় ভয় লাগে, হাঁফ লাগে। জমির আলোর ওপর ঘাসগুলো শুকিয়ে খড় হয়ে গেছে। সেই আলোর গায়েই শুয়ে আছে মেটে রংয়ের খেঁকশেয়াল, তার যতটা শেয়াল, ততটাই লেজ। হ্যাঁ, এবার সে উঠে দৌড় দিলে এতক্ষণ পরে একটা কিছু ঘটল বটে! একটু যেন নড়ে উঠল সারা মাঠ। যেসব পানসে রং, ধুলোর রং, মাটির রং, ছাই রংকে রং বলেই মনে হচ্ছিল না এতক্ষণ, এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে, রং ছাড়া কিছুই নেই। শাদা রং, কালো রং, সবই রং। ওই তো ওই সব রংয়ের উপরেই একটার পর একটা পোঁচ পড়ছে আর তখন মনে হচ্ছে, তাই তো রংয়ের অভাব কী? মাঠ ঘাট আকাশ ফাঁকাই বা কই? সব তো ভরা ভরা। যে খেঁকশেয়ালটার পেছনে দৌড়চ্ছিলাম এতক্ষণ, জানি, কোনো মানে নেই, ও আমার চেয়ে দশ গুণ জোরে ছুটতে পারে। দেখছি দুজনের মধ্যে ফারাক বেড়েই যাচ্ছে। আর ওকে যদি ধরতেই পারি তাতেই বা কী হবে? খেঁকশেয়ালের কামড় খেলে আমাকে আর দেখতে হবে না। তবু আমি দৌড়ুই। শেয়াল দেখলেই নাকি তার পিছু পিছু দৌড়তে হয়। দেখতে দেখতে ফারাক অনেকটা বেড়ে গেল। শেয়াল আর তার লেজ দুটিই ছোট একটা বিন্দু হয়ে গিয়ে ঢুকল বনকুলের ঝোপে। ওদের কত জায়গা যে আছে লুকানোর? একদম হঠাৎ মাটিতে ঢুকে গেল—কে জানত ওখানে তার একটা গর্ত আছে বা ঢুকল একটা আকন্দ ঝোপের মধ্যে কিংবা পাকুড়গাছের খোঁদলে।

শেয়াল তাড়া করতে গেলে লেজ-কাটা গাঁয়ের কুকুরটা আর তার বউ মুরগিখাকিটাকে আনতে হতো। আর একা নয়, একা কি হয়, তিন-চারটে রাখাল বন্ধুকে আনতে পারলে তারা ঠিক মাৎ করে দিতে পারত। চারদিকের মেটে রংয়ের মধ্যে খেঁকশেয়ালটা যেই বনকুলের ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল, অমনি দেখতে পেলাম ঝোপটা যেন একটা হামাগুড়ি দেওয়া হাতি, ছোট লেজটা তার আঙুল তোলার মতো উঁচু হয়ে আছে। কী আশ্চর্য, এত যে ফাঁকা আর মেটে মেটে লাগছিল। মাঠের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুপুরবেলার কানে তালা ধরার মতো ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, সেই সব কিছুই আর নেই এখন। যেখানে-সেখানে বনকুল, শেয়াকুল, বৈঁচি, আকন্দের ঝোপ। চোখটা একটু সয়ে এলে ধুলো—লেপা রংটাও যেন মুছে গেল, সবুজ রং, ছায়া আর কালো আঁধার দেখতে পাওয়া গেল। দূরে দূরে হলেও কী বিরাট এক একটা বট, না হয় অশথ, না হয় শিমুলগাছ। সেখানে নিরেট আঁধারের মতোই কালো কষকষে ছায়া, গরু-চরানো রাখালগুলো সেখানে গামছা পেতে ঘুমোচ্ছে। ঘাস সব শুকিয়ে গেছে, তবে ময়ূরকণ্ঠী বড় বড় ঘাস এখানে-ওখানে মাথা দোলাচ্ছে। মাঠ পুকুরগুলো সবই শুকিয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের উঁচু পাড় আর পাড়ের ওপর জঙ্গল, তালগাছ, জামগাছ বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুকনো পুকুরে নেমে গেলে দেখতে পাব। ট্যাংরা পুঁটি মৌরলা চিংড়ি মাছ শেষ পর্যন্ত পুকুরেই ছিল। সরে যেতে পারেনি, তারা সব কাদামাখা হয়ে শুকিয়ে শুকনো কাদার ওপরেই মরে পড়ে আছে। ঘন শ্যাওলা দলা পাকিয়ে আধশুকনো হয়ে চিমসে গন্ধ ছাড়ছে আর দু-চারটে শামুক অন্য পুকুরে যাওয়ার জন্য হয়তো রওনা দিয়েছিল। তারা আর বেশি দূর যেতে পারেনি। তাদের শাদা সোনালি খোলগুলো ঢাকনা বন্ধ করে পড়ে রয়েছে।

আমার খালি মনে হয়, দুনিয়া একবার মরে, একবার বাঁচে। এই মরে, এই বাঁচে। শেয়ালটা যখন দৌড়ে পালাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল সব মরা আর রং যা আছে সে-ও মরা। অথচ এখন মরা শামুক দেখছি, দলে দলে মরা ছোট ছোট মাছ দেখছি, একটি দুটি শামুক পায়ের তলায় কুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে এই মাত্র সব আবার বেঁচে উঠেছে। যে রোদটা ছিল শাদা, চোখ ধেঁধে যাচ্ছিল, বাতাসটা ছিল আগুনের মতো গরম ভাপওয়ালা, ধুলো আর কাঁকর এতক্ষণ যেন গালে চড় মারছিল আর এই বিরাট ফাঁকা আমাকে যেন কপ করে গিলে তার পেটের ভেতর চালান করে দিয়েছিল, এখন দেখছি একটুখানি মেঘ এল আর রোদটা মিইয়ে নরম হয়ে গেল। তার রংটাকেও একটু লালচে লাগছে, বাতাসও একটু যেন ঠান্ডা, আর সব ফাঁকা কই? কুমির-মার্কা, হাতি-মার্কা, ভালুক-মার্কা সব ঝোপ-জঙ্গল দেখা যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। বড় মাঠ পুকুরটার পুব আর পশ্চিমের উঁচু পাড়ের জন্য মনে হচ্ছে মাটিতে ঢেউ উঠেছে। সেই উঁচু পাড় দুটিতে ধুলো জঙ্গল ফুঁড়ে বড় বড় গাছ, আকাশছোঁয়া তালগাছের সার। তাদের গোড়ার মাটি ধসে পড়ে লোহার তারের মতো শেকড় ঝুলছে। উত্তরের নিচু পাড়ে এক জোড়া পাকুড়গাছ। মাঠ ফাঁকা আর কই? গরু-মোষের গাড়ির চাকার দাগ—এই দিগন্ত থেকে ওই দিগন্তে। মাঠের নিজেরই শাদা ধপধপে শুকনো নাড়িভুঁড়ির মতো পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব দিকে চলে গেছে। সব রাস্তার শেষে একটি করে মাটির বাড়ি, তারপর দু পাশে বাড়ির পর বাড়ি পেরিয়ে আবার এমনি মাঠ। উঃ, সব ভরা, সব ভরা, সব সব আছে, বুক ভরে বাতাস নিয়ে গাঁয়ের দিকে ছুটি, সব গাঁয়ের মতো আমাদের গাঁয়েও বাড়িঘর শুরু হওয়ার আগে থাকবে বড় গাছের বুড়ো গাছের, ফলন্ত গাছের, সফলা গাছের একটার পর একটা ছড়ানো বাগান। সেখানে শিরীষ অর্জুন হরীতকী নিম বাবলা সব সফলা গাছের সঙ্গে আম জাম বেল কৎবেল এই সব ফলন্ত গাছও থাকবে—প্রায়ই বুনো হয়ে গেছে, আম জাম বেল আমড়া যা ফলে তা খাওয়া কঠিন। এদের মালিক আমরা ছোটরাই, বড়রা কেউ আসে না ভাগ চাইতে। আমরা জানি কবে থেকে ওই পেল্লায় গাছটায় আর মুকুল আসে না, ফল ধরে না। ওই গাছ এখন বুড়ো থুত্থুরে হয়ে গেছে। আমরা জানি কোন গাছের বেল আর কোনো দিন পাকবে না। আর গাছটারই বা কী ছিরি, ঠিক যেন এক মরা রাক্ষসের কঙ্কাল, হাঁটু উঁচু করে পড়ে আছে। বড় বড় দিঘির উঁচু উঁচু পাড়ে এই সব বাগান আপনাআপনি তৈরি হয়েছে। পশ্চিমের উঁচু পাড়ে কী বিরাট ওই তালবন—কাছে যাবার উপায় নেই, ভাদ্র মাসে কত পাকা তাল যে পড়ে থাকে কাঁটা জঙ্গলে—কিন্তু দুপুরবেলায় ওখানে গেলে আর উপায় নেই, বড় বড় গোখরো, একটা রাজগোখরো, একটা বুড়ো লেজমোটা মতো বোড়া সাপ তো আছেই—সেটা আবার কাউকে কিছু বলে না, লেজ খসে গেছে অনেকটা—টেনে টেনে চলে কোনো রকমে—আর আছে ছাগল-খুরের খরগোশ আর একটা ভুরো-শেয়াল। তবে সবচেয়ে ভয়ের কথা হলো, দেখা যায় না ঠিকই, আমাদের বয়সী কয়েকটা ভূতের ছানা, তাদের কাজকর্ম কিছু নেই—এক একটা তালগাছের ঠিক মাঝখানে চড়ে আছে, বোঝবার উপায় নেই গাছে উঠছিল না গাছের মাথা থেকে মাটিতে নামছিল।

যাই হোক, আমরাই জানি কোনো কোনো দিঘি প্রায় মরা, তার পাড়ের জট পাকানো অন্ধকার তেঁতুলগাছগুলোয় একটা শাঁকচুন্নি তার ছেলে নিয়ে থাকে আর তার বেম্মদত্যি স্বামী রোজ আসে তার রোজগেরে ছেলেটাকে নিয়ে যাবার জন্য, তখন শাঁকচুন্নি নাকে কাঁদে আর দুপুরবেলায় চিল ডেকে ওঠে,

আমরা জানি কোন পুকুরে শুধু সাঁতার দেওয়া চলে, কিন্তু কিছুতেই শালুক আর পদ্মের জঙ্গলে ডুব দিতে নেই, তাহলে আর বেঁচে ফেরা যাবে না।

এই সব বাগান-টাগান আছে। তারপর গাঁ ঘিরে চারপাশে বাড়ির কুটুমের মতো আলাদা সব জমি আছে—মাঠের জমি যেমন খানিকটা দূরে আর একটু পর পর মনে হয়, এরা তেমন নয়। শীতের শেষে এখান থেকেই আসে তিলফুলের গন্ধ, সরষে ফুলের গন্ধ। কুমড়ো আর ঝিঙের হলুদ ফুলে মাঠ ছেয়ে যায়। তখন যত রং চাই, তত রং পাই। যত পাখি চাই, তত পাখি আসে, যাদের তেমন চাই না—বাজ ইগল কাক চিল, শিকরে, শকুন—তাদেরও পাই।

সত্যি কি ভুল কথা যে ভালো লাগে না এই দেশ, মাঠঘাট সব মরুভূমির মতো, কেবলই ধুলো আর বালি ওড়ে, আর ছাই ছাই, মেটে মেটে রং ছাড়া আর কোনো রংই চোখে পড়ে না—না, ঠিক নয় এসব কথা। একটু সময় তো দিতে হবে দেখার জন্য, শীতের শেষে একবার দেখো, ছায়াতে, গাছে, দিঘিতে, জলে সমস্ত গাঁ ঘেরা, তার উত্তর পুবে আবার বাঁশবনের আঁধার, গাঁয়ের ভেতরে তেমন গাছ নেই—ধুলোয় কাদায় ভরা রাস্তা, গিসগিস করছে গায়ে গায়ে লাগানো সব মাটির বাড়ি—কিন্তু শিবতলায় জোড়া পাকুড়গাছ আছে, বাউরি পাড়ায় একটা কী বিরাট বটগাছ আছে, পালবাড়ির দুটি বড় পুকুরে অশথগাছ, গুলঞ্চগাছ—ও বাবা গুনে তো শেষ করা যায় না, দেখছি তো ফাল্গুন মাসে—কী দারুণ সবুজ, বাতাসটাও সবুজ। আর যদি জল পাই, শ্রাবণ-ভাদ্র আসতে দাও—চোত মাসের ফাঁকা হু হু, শ্রাবণ মাসের ভরা—ভরা—কিছুই ফাঁকা নেই, সব ভরে গেছে, আর একটুও খালি নেই, মাঠ এখন সাগর, গাঁয়ের পশ্চিমে মহানালার নামটি এখন ঠিক লাগসই, সে এক নদী—স্রোত বয়ে যাচ্ছে—অথচ আমাদের নদী দেখতে কত দূর যেতে হয়, সেই মঙ্গলকোটে অজয়, কাটোয়ায় ভাগীরথী আর অজয়, কত দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর। গাঁয়ের আধক্রোশটাক দূরে বামনি বলে একটা নদী আছে—কিন্তু সেটা কী নদী, খালও তো বলা যায় না। চুর চুর করে রুপোর পাত্রের মতো জল বয়ে যায়, ধলশে, মৌরলা আর পুঁটি মাছ কানকো বেঁকিয়ে উপরে উঠতে চায়। এই তো এ দেশে নদীর চেহারা। এখন শ্রাবণে একবার তাকিয়ে দেখো, গাঁয়ের স্কুলের মহারাজার দিঘি ভেসে গেছে—সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে এক মণ ওজনের এক কাতলা—সারা গাঁয়ের লোক জাল, পলুই, ট্যাটা নিয়ে ছুটছে তার পিছু পিছু—তিমির মতো কালো পিঠ ও শিরদাঁড়া বের করে সেটা ছুটছে—জোলের মাঠ পার হলো, মহানালাও পেরোল, আমবাগানের বড় দিঘিটায় সে আর নামল না, চোখের পলকে তীরবেগে ছুটতে ছুটতে বাবলা বন গোরস্থান পেরিয়ে খোলা মাঠে—এখন তার সমুদ্রে পড়ল সে।

শ্রাবণ পার হবে, ভাদ্র পার হবে, আশ্বিন আসবে, দেখা দেবে আবার সমুদ্র—এবার সবুজ সমুদ্র, তার ওপর বাতাস আছে, ঢেউ আছে, সেই সবুজের তলায় জল আছে, মাছ আছে, সাপ আছে। আর একবার সব ভরে গেল। তারপর আবার একবার সব পূর্ণ হরে—তখন সব নতুন নতুন, আনকোরা, ঝকঝকে। তখন নেমন্তন্ন খেতে যাব। মাঠে গেলে দেখতে পাব সব ভরে গেছে। একটু আনাচকানাচ, কোন-টোন বাকি নেই, হাঁটতে গেলে পথ পাওয়া যায় না—ধানের শীষ চাবুকের মতো পায়ে এসে আছড়ে পড়ে।

গাঁয়ে কেউ আসতে চাইলে তাতে অনেক মুশকিল। পথঘাটের তেমন ব্যবস্থা নেই। আবার সবদিকেই পথ। যেকোনো একটা ধরে এলেই হলো। গরমের দিন দেখা যাচ্ছে ধু ধু মাঠ সমান বিছিয়ে আছে। কত দূরে চোখে পড়ে ধোঁয়া, আকাশের তলায় নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ভয় লাগে, সে কোথায়, কোন পথে গিয়ে কতক্ষণে ওই হালকা ধোঁয়ার মধ্যে ঢুকে দেখা যাবে ধোঁয়া নয়, মানুষের ঘরবাড়ি গরুছাগল গাছপালা নিয়ে গাঁ-ই বটে। তখন মনে হবে মৃতদের দুনিয়া থেকে জীয়ন্ত মানুষের দুনিয়ায় ঢোকা গেল! এসব গাঁয়ে ঢুকতে পথ খোঁজার দরকার কী? যেকোনো দিকেই পথ। দু-একটা শাদা চওড়া পথ-আল দেখা যাচ্ছে বটে, তা ছাড়া আছে সরু আলের ওপর দিয়ে অনেক হাঁটা পথ। আল থেকে নেমে জমির ওপর দিয়ে গেছে, আবার আলে উঠেছে—তারপর আর নেই। লোকে ছেড়ে দিয়েছে সে পথ। আর আছে গরুর গাড়ির চাকার দাগ। সে সব একটা আর একটার মধ্যে ঢুকে এমন পুঁটুলি পাকিয়েছে যে কোথায় গিয়ে মানুষ পৌঁছুবে তার কিছুই ঠিক নেই। ও রকম পথ না ধরাই ভালো—দিনে-দুপুরে ভুলো লেগে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খ্যাপার মতো এটা কোন দিক, ওটা কোন দিক করে মাথা চাপড়ে মরতে হবে।

এত সব কথা শীত আর গরমকালের জন্য বলা। বর্ষাকালে, ব্যস, আর কিছুটি নেই। সব বন্ধ—চারদিকে এক বিরাট কাদাজলের সাগর—গাঁ-গুলোই মুছে গেছে তো পথঘাট! তখনই উঠছে আসল পথের কথাটা। এখন বলতে হচ্ছে, আমাদের গাঁয়ে আসার জন্য আছে একটি মাত্র কাঁচা সড়ক। ইউনিয়ন বোর্ডের না জেলা বোর্ডের রাস্তা কে জানে!

এবার আসলের আসল পথটার কথা বলি।

বর্ধমান শহর থেকে উত্তর-পুবে কাটোয়া শহর পর্যন্ত মোটে পনেরো-বিশ ক্রোশের একটা রেললাইন আছে। এইটা হলো সারা দুনিয়া থেকে আমাদের গাঁয়ে আসার, আবার আমাদের গাঁ থেকে গোটা দুনিয়ার দিকে যাবার রাস্তা। কোম্পানির ছোট লাইন, মেটে মেটে লাল রঙের ট্রেন, কখনো কোনো গাঁয়ে ঢুকে কারও বাড়ির প্রায় উঠোনের ওপর দিয়ে, আবার কখনো খোলা মাঠের মাঝখান চিরে গুট গুট শব্দে ছোটে, গুড় গুড় করে নিজেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খড়ি নদীর ব্রিজ পেরোয়—ব্রিজে ওঠার সময় একবার থামে আবার ব্রিজ পেরিয়ে একবার থেমে নিঃশ্বাস নেয়। খড়ি নদী ঠিক যেন একটা উঁচু পাড়ওয়ালা খাঁড়ি, অনেক নিচে একদম তলায় নীল জল, এদিকে মাটি অনেক উঁচু, দিঘির পাড়গুলো মাটির পাহাড়ের মতো—উঁচু উঁচু ঘাস আর বেনাঝোপের জঙ্গলে ভরা। ট্রেনে থাকলে ব্রিজ পার হওয়ার সময় ট্রেন ভয়ে কাঁপে, ট্রেনের ভেতর আমরাও বুকে হাঁটু দিয়ে কাঁপি।

এই লাইনে খালি স্টেশন—এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ দূরে দূরে, ট্রেন থেকে লোক ওঠে আর নামে—কোথাও দুপুরবেলায় স্টেশন সুনসান, কেউ ওঠেও না, নামেও না, শুধু গার্ড ট্রেন থেকে নেমে ফুর-র-র করে হুইশল বাজিয়ে হাতের সবুজ পতাকা নাড়ায়, ট্রেন ছেড়ে দেয়, শাদা ভাপ ছাড়তে ছাড়তে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে প্রাণপণ দৌড়ুনোরা চেষ্টা করে।

বর্ধমান থেকে কাটোয়া, দিনে-রাতে সব চুপ—ঝড়ে বাতাসে বৃষ্টিতে রোদে কি চুপ—শুধু দিনে চারটে ট্রেন বর্ধমান থেকে কাটোয়ার মাঝামাঝি—না, তিন ভাগের দু ভাগ পথ পেরিয়ে, সাত-আটটা স্টেশনে হাজিরা দিয়ে আমাদের এই নিগণ স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। বর্ধমান শহর থেকে মোট দশ ক্রোশ উত্তর-পুবে নিগণ স্টেশনে নেমে একমাত্র মাটির কাঁচা সড়ক ধরে ঠিক মাপা এক ক্রোশ পুবে আমাদের এই সব গ্রামে আসা যায়, আসতে পারা যায়। রেললাইনের পাশাপাশি পাকা রাস্তা অবশ্য একটা আছে, সে রাস্তা আমরা ভুলে যাই, সে নাকি শের শাহর আমলের রাস্তা, বর্ধমান কেন, বর্ধমানের কত কত দূর থেকে এই রাস্তা এসে কাটোয়া শহরে ঢুকে আবার কোন দিক চলে গেছে! এটা হলো ভুলে যাওয়া রাস্তা, হাঙরের দাঁতের মতো পাথর বিছিয়ে আছে, ধুলো আছে, কাদা আছে, কোথাও কোথাও দু পাশে ঝাপালো বড় বড় গাছের জঙ্গল আছে। রাস্তার পাশে মজা দিঘির জলে যেমন পদ্মবন আছে, উঁচু পাড়ের মাথার ওপর তেমনি কালীমন্দিরও আছে। ফাবড়া মারা ডাকাত যেমন জঙ্গলে আছে, তেমনি খাঁড়া হাতে কালীভক্ত বাগদি ডোম ডাকাতরাও আছে। ও রাস্তায় কে আসবে? তবে আসতে চাইলে আর আসতে আসতে বেঁচে থাকলে অবশ্য নিগণে পৌঁছে ওই সড়কটা ধরে আসা যাবে গাঁয়ে। সড়কটা এসেছে পশ্চিমে মঙ্গলকোট থানার অজয়ের পাড় থেকে—তারপর আমাদের গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে ক্রোশ দুয়েক যেতেই দু পাশের মাঠ এসে গোটাগুটি গিলে নিয়েছে তাকে।

ট্রেনেই হোক, আর শের শাহর পাকা রাস্তা ধরেই হোক নিগণে পৌঁছে ওই সড়কই শেষ পর্যন্ত আমাদের গায়ে আসার বাঁধা পথ। পুব দিকে সিধে এক ক্রোশ, কিন্তু সড়কটা মোটেই সিধে নয়। তিনটে না চারটে 'দ' আছে রাস্তায় আর শেষ 'দ'টায় একটা 'ট' কারও লাগানো আছে। সবাইকে ওই 'দৈ'-এর ওপর দিয়ে আসতে হবে। আর আধক্রোশের মাথায়, পরপর দুটো 'দ'-এর মাঝখানে আছে পেল্লায় সেই অশথগাছটা। সড়কের একপাশে শুকনো ঘাসঢাকা পুকুরের উত্তর দিকে চাড়াল গড়ের পাকুড়গাছ—ছোট পাতার অশ্বত্থ, চেনে না এমন মানুষ নেই—পাকুড়। এই গাছের তলায় ঘন থকথকে কালো রাতের ছায়া, গায়ে মাখা যায়, যত গুমোটই পড়ুক, পাতার ফাঁক দিয়ে ঝম ঝম করে বয়ে আসার সময় বাতাসের তাত পাতায় পাতায় আটকে যাবে। এইখানে সড়কের মাটি আলগা ভুষভুষে, যেখানে-সেখানে গর্ত। গর্তে গর্তে একটি করে চন্দ্রবোড়া, কেউ কেউ মাথা বার করে আছে একটু একটু, শালিখ চড়ুই কি ছোট কোনো পাখি হাঁটতে হাঁটতে কাছে এলেই খপ করে ধরে একেবারে গর্তের ভেতরে টেনে নেবে। এ পর্যন্ত এখানে বিশটা মানুষ খুন হয়েছে, ভূতেরা মানুষকে জ্বালায় বটে, খুন করে না। মানুষই এই কুড়িটা মানুষ খুন করেছে। খুব খুন হতে পারে এখানে। তবু নিগণ থেকে সড়ক ধরে রোদে গরমে বৃষ্টিতে আধক্রোশ হেঁটে এসে এখানে খানিকক্ষণ বসতেই হবে। চারদিকের গাঁ-গুলোর দিকে চেয়ে দেখা চলে। আধক্রোশ দূরে, পুব দিকে গাঁয়ের দু-এক ঘর বড় গেরস্থের বাড়ির টিনের চাল বিকেলের রোদে ঝকঝক করছে, ঠাকুর বাগানের পুকুরের পাড়ে সার দিয়ে তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে—মনে হচ্ছে এই তো এসে পড়েছি, আর একটু বাদে। সড়ক ছেড়ে দিয়ে মোটা আলপথ ধরে মটরক্ষেত তিলক্ষেত আখক্ষেত পেরিয়ে সেই শেওড়াবনের পাশ দিয়ে গাঁয়ে ঢুকতে পারব—আর কটা মিনিট পরেই গাছ লতা ফুল পাখি মানুষ সবাই বেঁচে আছে দেখতে পাব আর ঢুকে পড়ব বাড়িতে সন্ধ্যের মুখে। তখন বুঝতে পারা যাবে সড়কটাই গাঁয়ে ঢোকার একমাত্র পথ নয়, ও পথ হয় কাদায় না হয় ধুলোয় ঢাকা থাকে বারো মাস, কত ঘুরে ঘুরে আসে—আমরা সবাই হেঁটে গাঁয়ে আসার সময় চাড়াল গড়ের একটু পরেই সড়ক ছেড়ে দিই।

এখন এই গোল-গাঁ সব গ্রামে ঢুকলে পথের শেষ নেই। সরু সরু মাটির পথ, একটু উঁচু-নিচু, বড় বড় গাছের তলা দিয়ে, পুকুরের পাড় ধরে, লতাপাতার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি পথ মনের স্ফূর্তিতে গাঁয়ের ভেতর ঢুকছে, গাঁ থেকে বেরিয়ে আসছে।

হাসান আজিজুল হক

উঁকি দিয়ে দিগন্ত

সচিত্রকরণ : শেখ আফজাল

তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী এসব তো আমরা বলি না, আমরা বলি ক্লাস থ্রি, ক্লাস ফোর। ক্লাস ফোরে উঠলাম এই সেদিন। ঠিক আগের মতোই—ক্লাস ওয়ান থেকে যা হয়ে আসছে—বলা ফার্স্ট, আমি সেকেন্ড। সাতজন ছিলাম থ্রিতে, সাতজনই উঠেছি। নতুন বই কী কী হলো, পাটিগণিত বা ইংরেজি কী বই তা মনে পড়ে না। ইতিহাস-ভূগোলের বই নিশ্চয় ছিল, মনে পড়ছে না। ওয়ার্ড বইটা তখনো ছিল আর নতুন বই বলতে পেলাম নীতিমালা চতুর্থ ভাগ। একেবারে নতুন বইয়ের গন্ধভরা। এখানে কী কী ছিল পড়ার, কিছুই কি মনে আছে ছাই!

ক্লাস থ্রির সঙ্গে তফাত এখন এই : পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে বসেছি। আর বলার সরদারি খুব বেড়ে গেছে। ওর গোঁফটা আর একটু চওড়া আর কালো হয়েছে। গলা ভেঙে গেছে, একটু চেঁচালেই ফ্যাসফেঁসে হয়ে যায় আর গা খালি করলে দেখতে পাই, তার বুকের বোঁটা দুটো সুপুরির মতো ফুলে উঠেছে। মুখে খারাপ কথা লেগেই আছে। মনে হচ্ছে, আর বোধ হয় সে ক্লাস ওয়ানে নেমে যাবে না। হয় এখান থেকে গাঁয়ের হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে যাবে, না-হয় এখানেই ক্লাস ফোরে থেকে বুড়োবে। পাড়ার মোসলমান দু-চারজন যারা আমার সঙ্গে পড়ত—হবিব, রউফ—তারা কবেই পাঠশালা ছেড়ে দিয়েছে। আমার চাচাতো ভাই শহিদুল অবশ্য আছে। মোসলমানপাড়ার আর একজনও এখন পাঠশালায় নেই।

রণমাস্টার আমাদের আর পড়ান না, ক্লাস ওয়ান আর টু নিয়েই থাকেন তিনি। দাশুমাস্টার একাই আমাদের সব বিষয় পড়ান—অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা,

একপাশে মাদুর পেতে আয়েশ করে বসেন দাশুমাস্টার

ইতিহাস, ভূগোল—সব। গাঁয়ের হাইস্কুলে এত দিন নাকি ক্লাস থ্রি, ক্লাস ফোর ছিল। গত কয়েক বছর ধরে তা আর নেই। স্কুল এখন ক্লাস ফাইভ থেকে শুরু। পাঠশালা থেকেই প্রাইমারি পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হবে। পরীক্ষা দিতে হবে দূরের অন্য কোনো স্কুলে, তারপর স্কুল। দাশুমাস্টার এত দিন ইচ্ছেমতো ছাত্রদের পাস-ফেল করিয়ে দিতে পারতেন, এখন আর তা হওয়ার জো নেই। পাছে তাঁর পাঠশালা থেকে কেউ ফেল করে, সেই দুর্নামের ভয়ে ক্লাস ফোর থেকেই সব দায় তিনি নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। মনে হচ্ছে, আমাদের কপালেই প্রথম এই বাইরে গিয়ে প্রাইমারি পরীক্ষা দেবার নিয়ম হলো। কাজেই সকাল থেকে—মাঝখানের দুপুরবেলাটা বাদ দিয়ে—বিকেল, সন্ধে, রাত পর্যন্ত পাঠশালায় খোঁয়াড়ের গরু-ছাগলের মতো আমাদের আটকে রাখা শুরু হলো।

দাশুমাস্টার এমনিতে খুব ভালো মানুষ, শুধু মেজাজটা যা একটু তিরিক্ষি। তবে এত অন্যায় করলে কেউ কি ভালো মানুষ থাকে? বেশ তো হলো, অত ভোরে পাঠশালায় আসি প্রায় কিছুই না খেয়ে, বাড়ি যেতে যেতে বেলা চড়ে যায়, গিয়ে মুড়ি না হয় বাসিভাত খাই, তারপরে কী করি কী করি খুঁজতে খুঁজতেই দুপুর পেরিয়ে যায়, পড়ন্তবেলায় ভাত খেয়ে আবার খানিকক্ষণ কী করি কী করি করতে করতে বেলা আর একটু পড়ে আসে—ব্যস, যেতে হবে এখন পাঠশালায়। হুঁ হুঁ বাবা, সোজা কথা নয়, এবার আমরা ভাতাড় স্কুলে গিয়ে প্রাইমারি পরীক্ষা দেব।

বিকেলে আমরা সবাই দক্ষিণের টানা বারান্দায় বসি। এখন আর চেয়ার নয়, একপাশে মাদুর পেতে আয়েশ করে বসেন দাশুমাস্টার; বিকেলে, সন্ধেয় রণমাস্টার আসেন না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মাস্টারমশাই তামাক টানতেই থাকেন। ধোঁয়ায় আঁধার করে ফেলেন চারদিক। দু-চোখ আধবোজা, নে, শ্রুতিলিখন লেখ—তত দিনে পেনসিল-খাতার মালিক হয়েছি—আকবরের রাজ্যবিস্তার। এত কথা থাকতে, এখন এই লিখতে লিখতেই সম্রাট আকবরের রাজ্যবিস্তারের কথাটা মনে পড়ে গেল কেন? তবে কি ভারতের ইতিহাস ভালোমতোই পড়তে শুরু করেছি তখন? নাকি গুলিয়ে ফেলছি, কোন কথা কোথায় টেনে আনছি কে জানে—বেরা, আহমদনগর, নর্মদা—এইসব নাম মনে আসছে কেন?

কোনো কোনো দিন সব ফাঁকা, দাশুমাস্টার আসেননি। মাদুর পাতা আছে। কিছুই পড়ছি না, কিছুই করছি না, শুধু বিকেলটাকে দেখছি। শুধু বিকেলটাকে দেখা যায় বৈকি! গাঁয়ের রাস্তায় একটিও লোক নেই, সাদা ফুলে কাঠমল্লিকা ছেয়ে আছে, সূর্য তেঁতুলগাছের মাথার আড়ালে ঢাকা পড়েছে, আর ফাঁকায় বেরিয়ে আসতে হচ্ছে না তাকে, এখন শুধু রোদটাই রাঙা হবে। এ সবই বিকেল দেখা ছাড়া আর কি! হঠাৎ ধুতির খুঁট গায়ে দাশুমাস্টার এসেই যা বাড়ি যা, সন্ধে সন্ধে চলে আসবি, হারিকেনের কাচ মুছে, তেল দিয়ে নিয়ে আসবি। তিনি তো বলেই খালাস, তাহলে আমাদের খেলা নেই? সারা দিনে একবারও খেলা নেই? দাশুমাস্টার এত অন্যায় করতে পারে?

সত্যিই, খানিক পরেই ফিরে আসি। আমাদের হারিকেনটা বড়, সন্ধের পর কাচটা আমরা নিজেরাই মুছে নিই। অনেক আলো হবে, জ্বাললেই ঝকঝক করবে। বলারা আনবে ছোট হারিকেন। তখন দু-রকম হারিকেন—গ্যাঁড়া আর লম্বা। দুকড়ি হারিকেনই আনতে পারত না, তাদের বাড়িতে নেই। কেরোসিন পাবে কোথায়? রেশনের দোকানের বরাদ্দের বাইরে কোথাও কেরোসিন নেই। গাঁয়ের মধ্যে আমার ন'চাচার রেশনের দোকান। চাচা রেশন-ডিলার। এখন তবু এক-আধটু রেশনে পাওয়া যায়। দু-তিন বছর আগে যখন ধুম লড়াই চলছিল সারা পৃথিবীতে, তখন কেরোসিনের ভয়ানক গরমিল। শুধু কি কেরোসিন? চাচার রেশনের দোকানে মোটা মার্কিন কাপড়, চটের মতো পুরু মিলের কোরা শাড়ি, চিনি, কেরোসিন আর বোধ হয় অ্যামোনিয়া সার বিক্রি হতো। আজকাল এসব কিছু কিছু পাওয়া গেলেও এখনো রেশনের দোকানেই এসব বিক্রি হয়।

ধোয়া-মোছা হারিকেনে এক হারিকেন তেল ভরে ভালো করে আঁধার নামার আগেই পাঠশালে হাজির। প্রথমেই আমাদের হারিকেনটা জ্বালানো হতো। একটি মাত্র দেশলাই কাঠি খরচ করে জ্বালতে হবে। জ্বালাত বলা। তারপর ছেঁড়া কাগজ ধরিয়ে ধরিয়ে বাকিগুলো জ্বালানো যেত। কেরোসিন খরচের ভয়ে কেউ কেউ জ্বালতেই চাইত না নিজের হারিকেন : এই তো আজুলদের হারিকেনেই বেশ আলো হচ্ছে, আর দরকার কী? তাই তো, দরকারি আলোটুকু ঘরে থাকলে যত খুশি ভাগ হোক না, কারও ভাগে তো কম পড়বে না! একজনই পড়ুক আর চারজনই পড়ুক, আলো পাবে সেই একই। হারিকেনটাকে মাঝখানে রেখে আমরা নিজের নিজের বই খুলে গোল হয়ে বসতাম। অন্যরা কেউ না জ্বালিয়ে হারিকেন রেখে দিত ঘরের এক কোণে, কেউ বা একদম কমিয়ে দিত বাতি। আসলে পড়ছে তো সবাই কত! বই খুলে রেখে দিত সামনে, যাতে মাস্টারমশাইয়ের আওয়াজ পেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে বইয়ের ওপর : নাউন হলো নাম, বস্তুর নাম, অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ—নাউন নাউন—করিম প্রতিদিন চিঁড়া ও গুড় খায়—চিঁড়া ও গুড়, চিঁড়া ও গুড়, অ্যাঁ, অ্যাঁ, করিম চিড়াং গুড়াং, চিড়াং গুড়াং খায় আর বলা সব সময়ই অন্য রকম, মহাসেয়ানা, সে শ্লেটের ওপর আঁক কেটে

যোগ, বিয়োগ, গুণ চিহ্ন দিয়ে জাল পেতে বসে আছে: আগে ব্র্যাকেটের কাজ, ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট, প্রথম ব্র্যাকেট।

এই অভিনয়টা একবারই করতে হতো প্রতিদিন। সন্ধেবেলা পড়া হতো না একটুও। মাস্টারমশাই খোনা ফকিরের মুদির দোকানে তামাক খেতে খেতে গল্প করতেন অনেক রাত পর্যন্ত। মাটির দোকানঘরটা মশলার ভেজা ভেজা গন্ধে-আটক অন্ধকারে ভরা, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, এক কোণে টিম টিম করে জ্বলছে একটা পিদিম। সেইটুকু আলোতেই শংকরীদা ঘুম ঘুম মিয়োনো গলায় কাশী দাসের *মহাভারত* পড়ছে: বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন জনমেজয় কিংবা হঠাৎ জেগে গিয়ে চনমনে গলায়, দেখ দ্বিজ, মনোসিজ জিনিয়া মুরতি। ওদিকে খোনা ফকির খোনা গলায় চাঁ খাঁও পঁণ্ডিত—এই বলে ছোট গ্লাস থেকে এক ঢোক চা নিজের গলায় ঢেলে নাক টিপে ধরে গিলে ফেলত। নাকের ফুটো টিপে না ধরলে চা-টুকু গলায় না ঢুকে নাক বেয়ে বেরিয়ে আসবে। দুটো পথ এক হয়ে গিয়েছে বলেই সে খোনা।

দোকানঘরে এইসব করতে করতেই আটটা-নটা বেজে যেত। পড়াটড়া মাথায় তুলে বলার সরদারিতে আমরা নরক গুলজার করে তুলতাম। হঠাৎ মনে হলো, তার এখন একটা চেয়ার দরকার। আমি ঘাড় গুঁজে বই খুলে বসে আছি। সে আমার পিঠে এসে বসল ঘোড়ায় চাপার মতো করে: আর পড়তে হবে না, য্যাতেষ্ট হয়েছে। দাঁড়া খচ্চর বলে আমি তার জানুর তলার দিকে একটা রাম চিমটি কেটে দিই, তখন সে বইটা কপ করে কেড়ে নেয়। খুদে এইবার খুব উৎসাহী: দেখ, হনুমান কেমন করে এক লাফে লঙ্কা গিয়েছিল। আমি এই কেলাশ ফোরের দেয়াল থেকে এক লাফে কেলাশ থিরির দেয়ালে কেমন করে যাই দেখ—এই বলে উপ্ শব্দ করে সে লাফ মারে। আমার হারিকেনটা উল্টে যায়, আমি দুকড়ির বইটা ধরে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিই। কাঁপা কাঁপা আলোয়-ছায়ায় সব লণ্ডভণ্ড ছত্রখান হয়ে যায়। বলা চেঁচাতে থাকে, এই মচ্ছব, মচ্ছব, দধিমচ্ছব! আমি আমার জানামতো চেঁচাই, জং, জং, জঙ্গনামার জং জং। আমার হারিকেনের ছিপিটা খুলে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তেলও পড়ে গেছে অনেকটা। কুছ পরোয়া নেই, ছিপিটা কুড়িয়ে নিল বলা। হারিকেনের এমন ছিপি ওদের কারও কাছে নেই। ওদের ছিপি কাঠের টুকরোয় কাপড় জড়িয়ে কিংবা শক্ত কাগজ পাকিয়ে পাকিয়ে তৈরি করা। আমারটা হলো আমাদের একনলা বন্দুকের খরচ হওয়া টোটার খোল। পেতল বা তামার মাথার দিকটা কেটে তৈরি। এত বড় গাঁয়ে হিন্দু-মোসলমান কারও বাড়িতে বন্দুক নেই। সেটা একটা বলার মতো কথা বটে। শুধু এ গাঁয়ে কেন, আশেপাশের বড় বড় কোনো হিন্দু গাঁয়েও এই আগুনে-অস্ত্র নেই। বরং এত বড় এলাকায় দু-চারটি যে বড়লোক মোসলমান পরিবার ছিল, তাদের প্রায় সবারই ঘোড়া আর একনলা, দু-নলা বন্দুক আছে। সবাই জানে, মোসলমানদের একটু জাঁকজমকের দিকে নজর। যা-ই হোক, চার আনা, ছ আনা, আট আনা দিয়ে বন্দুকের ভালো ভালো টোটা পাওয়া যেত—ইলি, রেমিংটন এক্সপ্রেস, এলজি, বিবি—এইসব। ইলির টকটকে লাল রং, মোম মাখানো যেন, রেমিংটনের সবুজ রং। নম্বর যত কম, শক্তি তত বেশি। আট নম্বর ছররা দিয়ে বড়জোর ঘুঘু কবুতর মারা যায়, ছ নম্বর পাঁচ নম্বর দিয়ে বক, সরাল—এইসব। শামখোল কাস্তেচরা মারতে এক নম্বর টোটা লাগবে। বাঘ মারতে এলজি, বিবি টোটা। ইলি টোটা ফায়ার হয়ে গেলে তার ফাঁকা খোলের ঝকমকে পেতলের মাথাটা কেটে নিয়ে হারিকেনের ছিপি বানাতাম আমরা। কেরোসিনে চুবচুবে হয়ে ভিজে যেত ছিপিটা।

বলা ছিপিটা কুড়িয়ে নিয়ে, আমরা কিছু বোঝার আগেই, একটা কাগজের টুকরো জ্বালিয়ে ছিপিটায় ঠেকাতেই সেটা দপ করে এক হাত লাফিয়ে উঠল। যে জায়গায় কেরোসিন পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল, সেখানটাতেও হুশ করে আগুন ধরে গেল। আমাদের মুখে, কপালে, চুলে পাতলা গরম লাল আগুন আর সাদাটে ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে। সারা ঘরে আলো। বলার যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল। সারা ঘরময় সে জ্বলন্ত ছিপিটা চাকার মতো গড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, লঙ্কা, লঙ্কাকাণ্ড হবে আজ—শালা রাবণের গুষ্টি পুড়িয়ে মারব। সুবলের হারিকেনে যেটুকু তেল ছিল, ছিপিটার ওপরে খানিকটা ঢালল সে, বাকিটা কেরোসিনের আগুনের ওপর। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, খুদে, এই শালার বামনা, হনুমান হয়েছিস তো ইদিকে আয়। লেজ নাই, হনুমান কিসের তুই? এই বলে সে কোথা থেকে এক টুকরো দড়ি নিয়ে খুদের হাফপ্যান্টের ফিতেয় বাঁধার জোগাড় করল। আমি দেখছি, আগুন এগিয়ে যাচ্ছে ঘরের দরজার দিকে। একবার বেরোতে পারলে হয়, বাইরে খড়কুটো ছড়িয়ে রয়েছে আর একবার দাওয়ার নিচে নামতে পারলেই শুকনো পাতার গদিটা পেয়ে যাবে সে নাগালের মধ্যে। বলা চোখ কুঁচকে খুব ভাবছে, কেমন করে জ্বলন্ত ছিপিটায় দড়ি বেঁধে খুদের লেজ বানিয়ে দেবে—এই সময় মাস্টারমশাইয়ের ছোট ছেলে নেনো দৌড়ে এসে খবর দিল, বাবা আসছে।

কথাটা কেবল শোনা বাকি—বলা থমকে চারদিক একবার চেয়ে দেখে নিল—হ্যাঁ, লঙ্কাকাণ্ড ঘটানোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আগুন দক্ষিণের দরজার চৌকাঠ পেরিয়েছে, খড়কুটোয় ধরল বলে। তারপর শুকনো ঝরাপাতার গাদায় পৌঁছুতে দেরি লাগবে না। এদিকে ঘরের ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলছে কেরোসিন। হারিকেনগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আমাদের হারিকেনের সেই ছিপিটা আগুনের গোলার মতো গড়িয়ে বেড়াচ্ছিল—এখন দেখছি সেখানে সুবল, প্রফুল্ল, শহিদুল—সবাই একবার করে লাথি কষাচ্ছে।

বোমার মতো ফেটে পড়ল বলা, নিভিয়ে ফেল, ওরে বাবারে, মাস্টারমশাই আসছে—এই বলেই সে চোখের নিমেষে এক লাথিতে জ্বলন্ত ছিপিটা নিভিয়ে ফেলল, হারিকেনগুলো সোজা করে বসিয়ে দিল আর বিরাট দুই লোহার হাতার মতো দু-পায়ের পাতা ধপ ধপ করে আগুনের ওপর চাপিয়ে অত বড় আগুনের কুণ্ডটাকে পিষে দিল। চটপট আলোগুলোকে জ্বালিয়ে চট-টট পেতে বই খুলে মিন মিন করে আমরা পড়তে শুরু করেছি মাত্র, দাশু মাস্টারমশাই এসে ঘরে ঢুকলেন। মেজাজ খুশিতে ভরা, চা খাওয়া হয়েছে, একটু কাশীদাস শোনা হয়েছে, প্রাণ ভরে তামাক টানা হয়ে গেছে। আর কী চাই: বলা, বইখাতা নিয়ে ইদিকে আয়, দেখি কী পড়ছিস? তুমি পালের গোদা বানর, এই বানরের দল নিয়ে কী করেছ তা আমি জানি। কাগজ আর কেরোসিন পোড়ার গন্ধ পাচ্ছি। একদিন সব্বনাশ হবে জানা কথা, তবে আমি এবার তোকে তাড়াবই তাড়াব। মামার বাড়ির আবদার পেয়েছ? গোয়াল ছাড়বে না ভেবেছ? বুড়ো দামড়া কোথাকার! ইংরিজি বল, ইহা একটি কলম। পড়াশোনার কথা হলেই বলার মুখে কী বিপদ যে দেখতে পাই আমরা! আপন মনে সে কেবলই বিড়বিড় করে। আজ বোধহয় বলাকে ছড়িপেটা করার কোনো ইচ্ছা মাস্টারমশাইয়ের নেই, তিনি দুকড়িকে বলেন, তুই বল। সে তোতলাতে তোতলাতে বলে, ইট ইজ এ পেন। বেশ, আমার একটি কলম আছে, ইংরিজি বল, আজিজুল, তুই বল। আমি কোনোরকমে বলি, আই হ্যাভ এ পেন। তবু ভালো হ্যাজ বলিস নাই, বলা বল, আমার একটি কলম ছিল। ইংরিজি কী হবে? বলা আকাশ-পাতাল ভেবে, চারবার ঢোক গিলে, বারদশেক চোখ পিটপিট করে বলল, মাই হ্যাভ এ পেন। কথা শুনে আজকের এত ভালো মেজাজের মাস্টারমশাই মেজাজ রাখতে পারলেন না, ঠাঁই করে বলার মাথায় এক গাট্টা মেরে তিনি নিজেই উঃ করে উঠলেন। নিরেট, ইট ভরা আছে গরুটার মাথায়। নিজের আঙুলের গাঁটগুলোয় হাত বোলোতে বোলোতে তিনি শুধু বলতে পারলেন, বেরো সব—বাড়ি যা।

অবশ্য সব সন্ধেবেলাই এ রকম নয়। অন্য রকমেরও আছে। যেমন সেদিন সন্ধ্যায় বসার চট, দপ্তর এক বগলে, আর এক হাতে হারিকেন নিয়ে আনমনে আসছি, এখনো অন্ধকার হয়নি তেমন, একদম কাগজে-কাটা পাতলা ফুরফুরে গোল এক চাঁদ দেখি পুবের আকাশ বেয়ে উঠে আসছে। বাঃ, আজ তাহলে পূর্ণিমা! আজ পড়া বারণ। বলা বলে, খবরদার, আজ বই খুলবি না, আজ হচ্ছে লক্ষ্মীপুজো। জন্ম থেকে মা সরস্বতীর ছিচরণ ধরে বসে আছি, আর তার বোন না দিদি মা-লক্ষ্মী কী দোষ করলে, আঁ? মাসে মোটে একটা করে পুন্নিমে পাই, মাস্টারমশাই পর্যন্ত আজ খোনা ফকিরের দোকানে তামাক খেতে যায় না, এক অক্ষর *মহাভারত* শোনে না, যায় গাঁয়ের চার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করতে। আজ পড়া বারণ। আমাকে নিজে মাস্টারমশাই বলেছে, আজ বই খুললে ঠ্যাং ভেঙে দেবে।

মাস্টারমশাই বলুক আর না বলুক, বলা বলেছে—তাহলে আর কথা কী! কাগজ-

কাটামতো পেল্লায় বড় সাদা চাঁদটা চড়চড় করে উঠে আসছে, কী ফুর্তি মনে, পাঠশালায় তাড়াতাড়ি পৌঁছুনোর জন্য পা-দুটো নিশপিশ করছে। গিয়ে দেখি আজ আগেভাগে সবাই হাজির। চট বিছিয়ে হারিকেন জ্বালিয়ে তৈরি হয়ে বসেছি। দপ্তর খোলা হবে না, শ্লেট, পেনসিলটাও বার করার দরকার নেই। পুজো শেষ করে মাস্টারমশাই ফিরবেন অনেক রাতে, চাঁদ তখন উঠে যাবে মাথার কাছে। তাই বলে আজ মাস্টার নেই কে বলেছে? সে যা খুশি তাই করছে, বলা তো আছে! কাউকে ঠাঁই করে মারছে একটা গাট্টা, কারও ঘাড়টা ধরে গুঁজে দিচ্ছে দপ্তরের ওপর, আজ জাবনা খাবি রে, জাবনা খাবি আর লেজ নাড়াবি আর দাশুর মুণ্ডু চটকাবি। উঃ, খুব বাড়াবাড়ি করছে আজ: শোন তবে। একটা ভাগ্নে থাকে আর সে বাড়িতে তার মাসি থাকে, মামা শালা থাকে না, কোন গাঁয়ে মুদিখানায় মাল ওজনের কাজ করে। এইবার বল্, ভাগনে কী করে আর মামা নেই বলে মাসিই বা কী বলে? এমন একটা কঠিন ধাঁধার জবাব আমরা কেউ দিতে পারি না। শুধু খুদে মিটি মিটি হাসে আর বলে, আমি জানি। এই বলা, বলব? না, মাইরি, দরকার নেই, তুই-ই বল। কী কী করা হয় আর কী কী বলা হয়, বলা বলে যায় আর আমার গা-শরীর কেমন শির শির করতে থাকে। যেন খুব অন্ধকার কিংবা খুব কম আলোর ঘরে ঘরে দরজা আঁটা। কেউ খুলছে না দরজা, বন্ধ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি অথচ যেন ঘরের ভেতরেই আছি। সবই দেখছি, শুনছি। বলা বলে, একজন জিজ্ঞেস করছে, নদীতে কত জল? পেরোতে গেলেই আর একটু হলে কাপড় ভিজে যাবে। তাহলে কতটা জল আছে নদীতে? শুনতে শুনতেই মনে পড়ে যাচ্ছে, এই রকম একদিন রাতদুপুরের মতো রোদে খাঁ খাঁ করা দিনদুপুরে হবিব হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার কেবল বিয়ে করা বড় ভাইয়ের দরজা-বন্ধ কোঠাঘরটা দেখাতে। এমন উৎসাহ হবিবের, সে ঘরের উত্তর দিকের ঘুলঘুলিটার নিচে কাঁধ পেতে দিয়ে বসল, আর আমি দু-পা তার কাঁধে দিয়ে দাঁড়াতেই টলমল করে উঠে দাঁড়াল। বেশ অন্ধকার কিংবা খুব কম আলোর ঘরের সিঁড়ির দরজা বন্ধ আর অবশ্যই সারা দুপুরের বাতাস বন্ধ। যখন একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠবে তখন বিরাট একটা শব্দ করে লম্বা নিঃশ্বাস নেওয়ার আওয়াজ হবে। না-হলে কিন্তু দুনিয়ার জানটা দুম-ফটাস করে ফেটে যাবে। সেই নিঃশ্বাসটা যতক্ষণ না পড়ল, আমি আধা ভূত আধা মানুষদের নড়াচড়া দেখছিলাম! কী রকম করে কার গায়ে যেন ঘুম লেপ্টে যায়, ঘামে শরীরে কাদা জমে, কিছুতেই চোখ খুলতে ইচ্ছে হয় না। বলা জোর করে মুখের মধ্যে মধু ঢুকিয়ে দেয়, জামায় দাগ লাগিয়ে দেয়, বাবার কাছে আমাকে মার খাওয়াবে বলে আর ছোপ ছোপ ময়লা ধরিয়ে দেয় ঠিক ঠিক কোথায় যেন!

বলার কথায় মাথা ঘুরছিল আমার, তখনই ধোপদুরস্ত মাস্টারমশাই এসে ঘরে ঢোকেন। কপালে মোটা করে সাদা চন্দন লেপা, খালি গায়ে ফর্সা ধুতির খুঁট জড়ানো। ঘরে এসে তিনি আর বসেন না, দাঁড়া, এখন সব বাড়ি যাবি, আজ আর পড়তে হবে না। পুজোর পেসাদ নিয়ে যা। হাত পাত সব। তখন ঝকঝকে মাজা কাঁসার থালায়—যেন সোনার থালা করেই—গুরুমা পেসাদ নিয়ে ঘরে ঢোকে। আলো চাল, দুধ, কলা, বাতাসা—এইসব মাখা পেসাদ দিয়ে থালাভর্তি। মায়ের হাত থেকে থালা নিয়ে থাবা থাবা পেসাদ দেওয়া হলো আমাদের হাতে। আমি বেশ মজা করেই পেসাদ খাই। হবিব আমাকে প্রায়ই বলে, হিঁদুদের পুজোর পেসাদ আবার খেতে আছে নাকি, দেখবি হিঁদু হয়ে যাবি, না-হয় মা-কালীর পাঁঠা হয়ে গিয়ে ব্যা ব্যা করবি। পেসাদ খেলে গোনা হবে। হয় হোক, আমি কোনো দিন কাউকে জিজ্ঞেস করতে যাইনি। আসল কথা, গন্ধভরা আলো চাল, দুধ, কলা, বাতাসা বা চিনি দিয়ে যে-ই মাখুক—হাড়ি, ডোম, হিন্দু, মোসলমান—খেতে কিন্তু চমৎকার। জিভে খাচ্ছি, ভালো লাগছে। আমরা পেসাদ চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামি, আলো চালের মতোই জ্যোৎস্নাটাও সাদা, রাত সাদা, রাস্তা সাদা, ধুলো সাদা, ঘরবাড়ি সাদা, নিমগাছের পাতাও ঝিকমিকে সাদা। বলা যেখানে-সেখানে যে ময়লা নোংরা মাখিয়ে দিয়েছিল, সেসব এখন আর নেই।

একটা উড-পেনসিল পেয়েছি। কাঠের, তবে গোল নয়, ছ-কোনা। রংটা ঘন হলুদ। পাঠশালায় কেউ পেনসিল নিয়ে যায় না, জোটেই না কারুর। সবারই শ্লেট-পেনসিল। আমার হলো বটে একটা পেনসিল! মামাতো ভাই আলম ভাই আমকাটা সাদা রঙের শিংয়ের বাঁটের ছুরি দিয়ে কী চমৎকার করে বেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কাগজ পাব কোথা, কাগজ কিনে দেবে কে? শ্লেট পেনসিল থাকতে মরে গেলেও কেউ আমাকে ওই টিটাগড়ের ফুলস্ক্যাপ কাগজের একটা তা-ও কিনে দেবে না। যা-ই হোক, পেনসিলটা পাঠশালায় সবাইকে দেখাতে তো পারব। আলম ভাইয়ের ক্লাস সেভেনের বাংলা বই পড়ে কালই জানতে পেরেছি, উড-পেনসিলকে উড-পেনসিল বা কাঠ-পেনসিল বলা ভুল, মহা ভুল। কাঠের একটা খোল থাকে বটে, তবে সেটা তো আর পেনসিল নয়। ভেতরের ওই শিষটা আসলে পাথরের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি। হুঁ হুঁ, ওই পাথরের নাম গ্রানাইট পাথর। পাথর, কিন্তু নরম পাথর। ওই পাথর গুঁড়ো করে তারপর আঠাটাঠা আর কিসব মিশিয়ে শিষ তৈরি করে কাঠের খোলের মধ্যে ঢোকানো হয়, তবে কিনা কলম হয়। কেউ জানে এসব? দেখি, সব শুনেটুনে বলা আজ কী বলে। যেমন খচ্চর আর গোঁয়ারগোবিন্দ, হয়তো বলে দেবে, য্যা য্যা, কত ধানে কত চাল হয় জানিস? তাই তো বটে, মাউতো...বউ, পোয়াতি মানুষ আমচুর খেতে ভালোবাসে কেন? আরও হয়তো কিসব খারাপ খারাপ কথা বলবে।

পাঠশালায় এসে দেখি আজ সব একেবারে চুপচাপ। দাশু মাস্টারমশাই নেই, রণমাস্টার কেন্নো পোকার মতো দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। সব সময়কার মতোই খালি গা, খাটো ধুতি উঠে গেছে একেবারে ওপর-জানু পর্যন্ত। তেমনি করে বসে দু-হাতে খুব চুল ছেঁড়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু গোটা মাথা তো পোড়া বেলের মতো প্লেন বাদামি, চুলের বংশ নেই, ছিঁড়বেন কী! অগত্যা রণপণ্ডিত দু-হাতে কপাল টিপে ধরে বসে রইলেন। তাঁর সামনেই পণ্ডিতমা দাঁড়িয়ে। চারকোনা পণ্ডিতমা, একবার দাঁড় করিয়ে দিলে আর নড়বে না। কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা চুল ব্যাটাছেলেদের মতো, গলায় সেই কাঠের না রুদ্রাক্ষের কণ্ঠী কে জানে!

পণ্ডিতমা বলছে, হাঁ রে রণ, তোরা করিস কী? বারণ করতে পারিস না? লেখাপড়া জানা মানুষ, গান-বাজনা পছন্দ করে, তাই বলে গান-বাজনা করতে গেলেই ওইসব গিলবে? জানিস না, দাশুকে গাঁয়ের লোকে কত মান্য করে? ছেলেপিলেদের অক্ষর শেখাবি বলে পাঠশালা খুলেছিস। হাঁ রে, কী চোখে দেখে তোদের ছাত্তররা? তারা জানতে পারলে কী মনে করবে?

কপাল ছেড়ে দিয়ে রণমাস্টার দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কী আর বলব কাকিমা, দাশু কি আমার কথা শোনে? একে তো আমি বয়েসে ছোট, তাপর শাস্তরটাস্তর কিছুই জানি না, ইংরিজিমিংরিজিও জানি না একফোঁটা। দাশু বয়েসে বড়, জি টি পাস, সংস্কৃত জানে, বাংলা জানে, ইংরিজিও একটু জানে। ওকে কি আমি কিছু বলতে পারি? তা-ও আমি সঙ্গে থাকলে হতো। আমি জানি সিদুই-এ যজমানের বাড়ি গিয়েছে একদিনের জন্য। ছি ছি, কী আফসোস, এমন করে মানুষ!

আমরা সব গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনছি। এসব কিসের কথা হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু দেখতে পাচ্ছি, বলার চোখ দুটো খুব মজায় চিকচিক করছে। কী হয়েছে ও ঠিক জানে।

পণ্ডিতমা অস্থির হয়ে উঠল, তা বসে আছিস কেন রণ—দেখ গা কত দূর কী হলো।

অস্থির হয়ো না কাকিমা, এক্ষুণি চলে আসবে। দেখুন তো, বারণ করতে না-করতে কে একজন এক ঘড়া জল ঢেলে দিলে দাশুর গায়ে। কোথাকার আহাম্মুখ বলো দিকি, জল ঢেলে দিলে যে নেশা চড়ে যায়, তা-ও জানে না!

তুই জানিস?

তা আবার জানব না!

অ, তুই-ও জানিস তাহলে—কপালে চাপড় মারল পণ্ডিতমা।

সকালে বাহ্যি করতে আমি একটু দূরেই যাই। দাঁ-দের হটকাপুরের পুব পাড়ে একেবারে পথের পাশেই বটগাছের তলায় দেখি দাশু পড়ে আছে। একেবারে অজ্ঞান। মুখের চারপাশে ভন ভন করে মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। সিদুই তো গিয়েছিল গতকাল, তাহলে দু-কোশ পথ হেঁটে এল কখন? আচ্ছা বলো দিকি, গাঁয়ের গুরুমশাই, কত ছেলেপিলেকে অক্ষর দিচ্ছে, শাস্তরের বিধেন দিচ্ছে! সারা গাঁয়ের পুরুত। একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না দাশুর? বলো তো,

অত সকালে আমি না দেখলে কী হতো? মদের গন্ধে শেয়াল-কুকুর এসে মুখ চাটত। যা-ই হোক, একা তো আমি ওকে তুলে আনতে পারব না, হাঁকডাক করে লোক জড়ো করতেও পারব না। কাদের একজন মাঝবয়েসি বউ হটকাপুকুরের জল নিয়ে যাচ্ছিল কলসিতে, আমাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নাজ কেড়ে কলসি কাঁখে দাঁড়িয়েছে—কোথা থেকে বেন্দা পাল এসে দেখি বউদি বলে কলসিটা কেড়ে নিয়ে হড় হড় করে দাশুর মাথায় ঢেলে দিলে।

ভালো মানুষের মতো মুখ করে কোঁকাতে কোঁকাতে সাতকাহন বলছেন রণমাস্টার। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মাস্টারমশাইয়ের বড় মেয়ে ধানীদিদি। ধানের মতো গায়ের রং, তাই ধানীদিদি। অনেকে আমাদের ভ্যাঙায়: মোসলমানি আলো ধানী, জলকে বলে পানি পানি। অল্পদিন হলো ধানীদিদির বিয়ে হয়েছে, সিঁথিতে সিঁদুর ডগ ডগ করছে।

গরুর গাড়িটা ঠিক তখুনি এল। মাস্টারমশাই এখন উঠে বসেছেন বটে, তবে কুঁজো হয়ে এমন মাথা ঝুঁকিয়ে রয়েছেন যে মুখ দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি থামতেই রণমাস্টার এগিয়ে গিয়ে পণ্ডিতমশাইকে নামিয়ে ধরে ধরে বাড়ির দিকে এগোলেন। এমন অদ্ভুত লাগছে মাস্টারমশাইকে দেখতে! ছোট ছোট চুল ভিজে লেপ্টে আছে কপালে, চোখ প্রায় বোজা, মোটা সাদা মার্কিন কাপড়ের পাঞ্জাবিটা সেঁটে আছে গায়ে, ভেজা ধুতি হাঁটুর ওপরে, কাছা ঝুলে পড়েছে। কে বলবে আমাদের মাস্টার। তে-পায়া কাঠের গুঁড়িটায় বসে বড় ডাবা হুঁকোয় নিশ্চিন্ত মনে যখন তামাক খান, মনে হয় বিশ্বজগতের মাস্টার। তার ওপরে আর কেউ থাকতে পারে বলে মনেই হয় না। এখন চুবচুবে ভেজা দাশুমাস্টার রণপণ্ডিতের কাঁধে হাত রেখে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন যেন বে-পাড়ার কুকুর মারামারিতে হেরে গিয়ে ডোবা থেকে পাড়ে উঠেছে লেজটা পেছনের দু-ঠ্যাংয়ের ভেতরে ঢুকিয়ে। আমার এখন মনে হচ্ছে মাস্টারমশাইয়ের চেয়ে আমরাই হেরে গিয়েছি বেশি। ভয়-পাওয়ানো মানুষের কাছে আর ভয় না পেলে নিজের কি কোনো অহংকার থাকে?

ধানীদিদির কটাশে ফর্সা মুখে বেশ কটা ছোট-বড় খোঁদল আছে, তার চুলগুলোও কেমন সোজা সোজা লালচে। এই ক-মাস আগে বিয়ে হয়েছে। বর কী করে জানি না। খুব লম্বা আর বেশ স্বাস্থ্য তার। একবার এসেছিল নিজের জ্যাঠাকে নিয়ে। জ্যাঠা লোকটা তখনো তত বুড়ো নয়, ঘাড়ে-গর্দানে বেশ মোটাসোটা, কাঁচাপাকা সোজা সোজা চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। ধুতির সাথে ফতুয়া পরনে। এত বলছি এই জন্য যে একদিন পাঠশালে ছুটির দিনে আমাদের ক্লাস থ্রি-ফোরের ঘরে গানের আসর বসেছিল। তবলা বাজাচ্ছিল ধানীদিদির বর। তবলার ওপর লম্বা লম্বা আঙুলের চাঁটির সে কী জোর! মাস্টারমশাই ছিলেন, সমে এসে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলেন আর গান গাইছিল বরের জ্যাঠামশাই: আমি ছিনু একা, বাসর জাগায়ে। একটু পরেই বেশ জমে গেল—বাসর জাগায়ে, এ—বাসর, বাসর জাগায়ে, বাসর জাগায়ে—কত রকম করে বাসর জাগায়ে, তারপরে আমি ছিনু, আমি ছিনু, আমি ছিনু, আমি ছিনু একা—দড়াম করে ধানীর বর তবলায় চাপড় মারল। দাশুমাস্টার শুধু বললেন, সাধু সাধু!

তাহলে মাস্টারমশাই আর কোনো দিকে না তাকিয়ে গাইয়ে ছেলের সঙ্গে ধানীদিদির বিয়েই বা দেবেন না কেন, আর টইটুম্বুর মদ খেয়ে ভিনগাঁয়ের যজমানের বাড়ির গানের আসর থেকে ভোরবেলায় বাড়িই বা ফিরবেন না কেন? সবই ঠিকঠাক।

বলাকে আমি ছাড়তে পারি না। ওকে ছাড়া চলবে না আমার। অনেক শিখতে হবে আমাকে ওর কাছে। কিন্তু ওকে আমার খুন করে ফেলা দরকার। ও আমাকে ঠিক মেরে ফেলবে। কে বিশ্বাস করবে এই কথা যে কিছুদিন থেকে আকাশে সুয্যি নেই? দিন আর রাত এক রকম। শুধু রাতটা বেশি অন্ধকার, দিনটা কম। ছাই ছাই রাতে পাখির ডাক শুনতে পাই, হুতোম প্যাঁচাগুলো ক্যাঁচকোঁচ করে, হুম হুম করে ডাকে লক্ষ্মীপ্যাঁচা, পুকুরে কলমিলতার ঘন জঙ্গল থেকে কলরব করে ওঠে ডাহুকগুলো। কিন্তু দিনে কোনো পাখির সাড়াশব্দ নেই। আকাশে সুয্যি আছে ঠিক, কিন্তু আমি দেখছি নিভে গেছে—সারা গাঁয়ে ভীষণ ঠাণ্ডা ছায়া।

সুয্যি নেভার দিন সুবল শুধু একটা কথা বলেছিল, রায়েদের লক্ষ্মীদা কলকাতায় মোচনদের হাতে কাটা পড়েছে। সে বলেনি যে তোরা কেটেছিস লক্ষ্মীদাকে, শুধু বলেছে মোচনরা কেটেছে, যেন আমি মোসলমান নই, আমাদের গাঁয়েও নেই কোনো মোসলমান। কদিন থেকে শুনছি বটে—হিঁদুরা বলছে কলকাতায় কাটাকাটি হচ্ছে, মোসলমানরা বলছে সেখানে 'হিড়িক' লেগেছে হিঁদুতে আর মোসলমানে। 'হিড়িক' আর 'কাটাকাটি'—একটা মোসলমানদের কথা, আর একটা হিঁদুদের কথা। পাঠশালা ছুটির পর বইপত্তর গুটিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে আসব এই সময় সুবল তার চ্যালা চ্যালা দাঁত বার করে বলল, রায়দের লক্ষ্মীদা কাটা পড়েছে।

লক্ষ্মীদাকে আমরা খুব বেশি না দেখলেও চিনি। খুব পাতলা, খুব ফর্সা আর কবুতরের মতো বুক। বুকের খাঁচাটা গোল। একটু কুঁজোমতো। লক্ষ্মীদা রায়বাড়ির ছোট কর্তার বড় ছেলে। আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে বসে বিড়ি খেত। ভাইজানকে ভীষণ ভয় করতাম বলে কোনো দিন সামনে যাইনি। লক্ষ্মীদারা খুব উঁচু বামুন আর ছিল গাঁয়ের সবচেয়ে সম্পত্তিওয়ালা। যেদিকেই যাই, শুনি এসব রায়দের। এই পুকুরটা রায়দের, এই বাগানটা রায়দের, এইসব বড় বড় ভিটে রায়দের। সবই ঠিক আছে, শুধু সব কথারই শেষে একটা করে 'ছিল'—মানে রায়দের ছিল, ওই পুকুর, ওই বাগান, ওই পোড়ো দশ বিঘে জমি—সবই রায়দের ছিল। এখন কিছুই নেই। গাঁয়ের সব বাড়ির ভিটের তুলনায় রায়দের ভদ্রাসন একটু উঁচুতে। সেখানে উঠলে খুব বড় একটা পাকা বাড়ি, ইটের ওপর পলেস্তারাফলেস্তারা তো দূরের কথা, ইটগুলোই এখন লাল ধুলো হয়ে গেছে। একটি মাত্র ভাঙা ঘর এক কোণে পড়ে আছে। তার ছাদের বড় বড় ফাটল দিয়ে রোদবৃষ্টি হাড়-কাঁপানো বাতাস ঢুকে পড়ে ঘরে। তবু সেখানেই ছেলেমেয়ে, বউ নিয়ে থাকে রায়বাড়িরই কেউ। ওই বাড়ির পেছনেই রায়দের পাকা মন্দির, ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। কণ্টিকারি, গোয়াল-লতা, ধুতরো, আকন্দের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আরও আছে গোখরো সাপের আস্তানা, ছাদের বড় চাঙরের তলায় গাঁয়ের কুকুরদের আঁতুড়ঘর। তারপর আর একটি পাকা বাড়ি—দরজা, জানলা, ছাদ—কিছুই নেই, জনমানবশূন্য। সব ওই উঁচু বিরাট ভিটের চাতালের মধ্যে। সবশেষে রায়দের ছোট কর্তার বাড়ি। ময়দার বস্তার মতো সাদা মোটা, নাকের তলায় বিরাট আঁচিলওয়ালা লক্ষ্মীদার মা, পেটে দাদওয়ালা ভিখিরি বাবা, খুব সুন্দরী দু-বোন আর ছোট ভাই মানিক থাকে সেখানে। ওদের কোথাও আর কিছু নেই। মাটির ঘরের পাঁচিল, তা-ও ভেঙে পড়ছে। শুধু খড়ের চালের তলায় সেগুন কাঠের মকরমুখো, হাতিমুখো, চাঁদসুয্যি আঁকা কড়ি-বরগাগুলো এখনো আছে। ছোট রায় ভিক্ষে করে। তাই বলে সে ভিখিরি নয়। গাঁয়ে ভিক্ষে করে না। প্রতিদিন এগাঁয়ে-ওগাঁয়ে ভিক্ষে করে দুপুরের পরে ফিরে এসে তেল মেখে চানটান করে গাঁয়েরই আর পাঁচজনের একজন হয়ে যায়।

এই বাড়ির বড় ছেলে লক্ষ্মীদা। সে কোনো দিন ভিক্ষে করেনি, করবেও না। তার গায়ে দাদটাদ কিছু নেই, তার পৈতেও তার বাবার মতো অত ময়লা নয়। সেই লক্ষ্মীদা কলকাতায় কী করত আমি জানি না। কলকাতায় থাকে, এই যথেষ্ট। কলকাতায় থাকাটাই বিরাট মান। কী করে জিজ্ঞেস করার দরকারই নেই। কলকাতায় যারা থাকে, তারা সবাই দুগগা পুজোর সময় গাঁয়ে আসে। গাঁয়ে চাঁদের হাট বসে যায়। লোকে হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা কেউ কখনো খালি গায়ে থাকে না বলে সবারই চামড়া সাদা, অনেক দিন চাপা থাকলে সবুজ ঘাস যেমন সাদা হয়ে যায়। খুললেই গেঞ্জির স্পষ্ট দাগ দেখা যায়। যেন গেঞ্জি এঁকে দেওয়া আছে গায়ে, শরীরের তুলনায় গলাটা একটু কালো, সেখানে গেঞ্জির দাগ।

এই লক্ষ্মীদাকে কেটে ফেলেছে। এ কথার মানে কী? লাউ না কুমড়ো লক্ষ্মীদা যে ঘ্যাঁষ করে কেটে ফেলবে? কে কাটবে? মোসলমানরা কেটেছে। তার মানেই বা কী? আমি কোনো দিন লক্ষ্মীদাকে কাটব না। আমাদের গাঁয়ের কোনো মুসলমানই তাকে কাটবে না। হ্যাঁ, কেটে ফেলতে পারে ঠিকই, চোর-ডাকাত না হয়েও খুব বেশি রাগটাগ হলে হাতে কুড়ুল বা কোদাল থাকলে কেটে ফেলতেও পারে কেউ। এই সেদিন যেমন এককড়ি গাবা কাটা তার আপন চাচাতো ভাই চণ্ডী গাবা কাটার ঘাড়ে ঝপাৎ করে কোদাল বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল বাড়ি থেকে বৃষ্টির জল বার করার

নালা নিয়ে ঝগড়ার সময়। আমি নিজে শুনেছি, এককড়ি বাবাকে বলছিল, পণ্ডিতমশাই, সব্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল। একেবারে নরহত্যার পাপ করে ফেলছিলাম। বিভে এসে যদি ডান হাতের নড়াটা চেপে না ধরত—এমন করে ধরেছিল বিভে যে হাত নামাতেও পারি না, তুলতেও পারি না, কোপটা আর দিতে পারলাম না পণ্ডিতমশাই। যাই হোক, কাউকে খচাং করে কাটা কি সোজা কথা? তবে লক্ষ্মীদাকে কেউ রাগ করে মেরেছে, তা নয়। মোসলমানরা মোসলমান বলে আর হিঁদুরা হিঁদু বলে মেরেছে। জন্মের আগে লক্ষ্মীদা কি বলতে গেছে, আমাকে হিঁদু করে দাও, না, যে মোসলমানরা তাকে মেরেছে তারা জন্মের আগে কাউকে বলতে গেছে, আমাদের সব মোসলমান করে দেবে কিন্তু।

আর কারও কিছু হলো না, মাঝখান থেকে শুধু আমার কাছে দপ করে সুয্যিটা নিভল। চারদিকে এত আলো, অথচ আমি দেখি সব মিয়ানো, যেন বৃষ্টি হবে, যেন সবাই চাপা পড়ে যাবে। খালি মনে হচ্ছে, কারা যেন আমার ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ কাটছে। আচ্ছা, কীভাবে মেরেছে রোগা-পটকা কবুতরবুকো লক্ষ্মীদাকে? ঘরের ভেতরে, বাড়ির উঠোনে, রাস্তায়? কখন? সকালে, দুপুরে, সাঁঝে? কতজনে মেরেছে, কী দিয়ে মেরেছে, কোপ পড়ার আগে হাত তুলেছিল কি লক্ষ্মীদা? বলেছিল, আমাকে মেরো না, আমার বাপ ভিক্ষে করে খায়? আমার এ রকম কেন মনে হচ্ছে কে জানে?

সুবল যা বলল, তেমন কথা আগে কোনো দিন শুনিনি। তাই আবার হয় নাকি? চেনা নেই, জানা নেই, কোনো দিন চোখে দেখা নেই, যে-ই জানা গেল লোকটা মোসলমান অমনি একজন বা দশজন হিঁদু এসে তাকে ছোরাছুরি মেরে খুন করবে কিংবা যে-ই দেখা গেল একটা ধুতিপরা হিঁদু অমনি একদল মোসলমান এসে তাকে জবাই করে ফেলবে? এ রকম কথা তো মাথাতেই ছিল না আমার অথচ যে-ই সুবল একবার বলল লক্ষ্মীদা কলকাতায় কাটা পড়েছে অমনি তারপর থেকে হিঁদুপাড়ায় মোসলমানপাড়ায় শুধুই শুনছি কাটাকাটি আর হিড়িকের কথা। মোসলমানপাড়ায় একরকম, হিঁদুপাড়ায় আর একরকম। মোসলমানপাড়ায় শুধু হিঁদুদের মোসলমান কাটার কথা আর হিঁদুপাড়ায় খালি নেড়েদের হিঁদু কাটার গল্প। কোনো দিন এমন ছিল না, দু-দিন তিন দিনের মধ্যে এমন হয়ে গেল কেন? কোথা কলকাতা, আমি কোনো দিন যাইনি। বর্ধমান শহরে অনেকবার গিয়েছি। সেই কলকাতায় এখন দিন কেমন, রাত কেমন কে জানে! ওই যে গলির মোড়ে একজন দাঁড়িয়ে, লোকটা লুঙি আর হাফশার্ট পরে আছে। লক্ষ্মীদার মতো ধুতিপরা একজন উল্টো দিকের গলি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। সে বোধ হয় রাঁধুনি বামুন। হাতে রান্নার হাতা-খুন্তি। লুঙিপরা লোকটা কাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল, তিন-চারজন তার পাশে এসে দাঁড়াল, তারপর রাস্তা পার হলো। ওদিকের ধুতিপরা লোকটার চোখ যেন ভয়ের চোটে ফেটে বেরিয়ে আসবে। তার পেটে যখন ছুরি ঢুকল, কেমন একটা 'খ্যাঁস' শব্দ হলো। লোকটা কোনো শব্দ করল না। শুধু আলগোছে শুয়ে পড়ল।

আবার যেন দেখছি, গলির পর গলি—কী সরু সরু সব গলি—দু-দিকে সারবাঁধা তিনতলা চারতলা বাড়ি। মালকোঁচা মারা একটা লোক পাঁঠা-কাটা খাঁড়া হাতে একটা বাড়িতে ঢুকল, কোন দিক থেকে তখুনি হাজির হলো আরও দশ-বারোজন। ঘরের ভেতরে একজন নামাজ পড়ছিল, একটা দশ বছরের মেয়ে হাতে মেহেদি দিয়ে বসে ছিল, বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে ছিল এক বুড়ি। একটু পরে ওখানে শান-বাঁধানো উঠোন দিয়ে ফেনা আর বুদবুদ-মেশা রক্ত ছুটে যাচ্ছিল।

যারা এসব কাহিনি বলছে তারা কি সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এসেছে? কাকে বলি, এসব বোলো না, হচ্ছে তো হোক, বোলো না? কারও চোখে হিংসা, কারও কথায় হিংসা। কেউ বলছে, নেড়েদের আর এ দেশে জায়গা নেই; কেউ বলছে, একজন কাফেরকেও আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। হিঁদুপাড়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটি, কেউ কিছু বলে না, শুধু চেয়ে থাকে। মোসলমানপাড়ায় ঘুরি—দাঁত কিস কিস করতে থাকে কেউ, বে-দ্বীনদের একবার বাগে পেলে হয়।

আমি ছোট হতে হতে এইটুকু হয়ে যাই। নিজের ভেতরে নিজে লুকোনোর জন্য আঁতিপাঁতি করে জায়গা খুঁজি। খুব ছোট হতে পারলে খুব ছোট জায়গাতেই লুকোনো যায়। একটা ছোট গর্ত খুঁড়তে পারলেও সেখানে ঢুকে পড়া যায়। ঘুমিয়ে পড়লে কি তা হতে পারে? মায়ের মুখের দিকে তাকাই, ফুফুর মুখের দিকে, চাচাদের দিকে চেয়ে দেখি, কই, কারও ভয়-ভীতি নেই। বড়জোর এক একটা খুনের কথা, হিঁদু হোক কি মোসলমান, মা-ফুফুরা শুধু আহা আহা করে, তারপর যে কাজ করছিল তাই করে যায়। আমার এমন হচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে, সারা গাঁয়ের সার সার ঘরবাড়ি আপনা-আপনি মাটিতে ধসে পড়ল। কালো ধুলো আর কালো বাতাস আকাশজুড়ে উড়ছে আর চারদিকের কাছের দূরের গাঁ-গুলোকে ঢেকে দিচ্ছে। আমি কিছু বলছি না বলে ফুফু বা চাচারা কি আমাকে ডেকে বলবে না যে দু-দিন পরেই সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে?

এইবার বলাকে আমার খুন করে ফেলার ইচ্ছাটার কথা বলি। অন্যদিনের মতো সেদিনও সন্ধের একটু পরে পাঠশালে গিয়েছি। জানা কথা, পড়তেটড়তে আমরা বসব না। হারিকেনগুলোর বাতি কমিয়ে দিয়েছি, শুধু শুধু মাগ্যির দিনে কেরোসিন পুড়িয়ে লাভ কী! ঘরে আলো খুব কম, ছায়া বেশি। আমাদের সকলের ছায়া বিরাট বিরাট, ঘরের চালার মাথায় গিয়ে ঠেকেছে। বলা আমাকে ডেকে বলল, শোন, কী ঠিক হয়েছে জানিস তো? এ তল্লাটে একটি নেড়েকেও আর রাখা হবে না, সব কচুকাটা করা হবে। কথাটা শোনার সাথে সাথে আমার তো বটেই, আমার ভাই শহিদুলের মুখও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আড়চোখে সেদিকে একবার চেয়ে বলা আবার শুরু করল, কারা ঠিক করেছে জানিস? আমাদের গাঁয়ের ম্যাদামারা তিলিরা নয়—বলা নিজেও তিলি, এখন তার ওসব খেয়াল নেই—ঠিক করেছে নাসগাঁয়ের আগুরিরা। আঠারো-পাড়া গাঁ, এত বড় গাঁ এ দিগরে আর নেই, সব আগুরি, অন্য জেতের একটি ঘরও নেই। খাঁটি আগুরি, ফর্সা ধবধবে, ইয়া চওড়া ছাতি, ইয়া বড় টাঙি গোঁফ। সব মা-কালীর ভক্ত। বড়-বেলুনের বড়-কালীর কথা জানিস? নাসগাঁয়ের পাশের গাঁ। ওই গাঁয়ের কালী বাইশ হাত লম্বা, দু-হাত লম্বা জিভ, মা কাঁচা বলি চিবিয়ে খায়। নাসগাঁয়ের আগুরিরা ওই কালীকে পুজো দিয়ে আজকেই এসে পৌঁছুবে স গাঁয়ে। একটি মোচমান রাখবে না। ভোররাতের মধ্যেই চলে আসবে। দেখবি, কপালে লাল চন্দন লেপা। হাতে সিঁদুর-মাখানো এই বড় বড় খাঁড়া, টাঙি, কিরিচ। দেখবি আর কি, দেখার আগেই তো মুণ্ডু কাটা পড়বে।

বলছে আর বলার চোখ বড় হচ্ছে। তাপর তোদের মোচনদের গাঁ ধারসোনা তো আছেই। এতক্ষণে আমি চিঁ চিঁ করে একবার বলতে পারলাম, একবার ধারসোনা যেয়ে দেখুক—একটি আগুরিকে আর ফিরতে হবে না।

হ্যাঃ, ওসব ভাইসাবদের জানা আছে আগুরিদের! সব কচুকাটা হবে।

পাশের গাঁ ধারসোনায় এক ঘরও হিঁদু নেই। সব মোসলমান। প্রায় পুরো গাঁ-ই লেঠেল। হিঁদু-মোসলমান যেকোনো জমিদার-জোতদার ডাকলেই চলে যাবে লেঠেলি করতে, বাছাবাছি নেই তাদের। এই তাদের পেশা। লেঠেল ছিল না শুধু ধারসোনার রউফ ভাই। পুরো চার হাত লম্বা—ফুটবলে ব্যাকে খেলত। একবার শট মেরে ইস্কুলের দালান থেকে একটা ইট খসিয়ে ফেলেছিল।

বলার কথা শুনতে শুনতে আমার হারিকেনের কেরোসিন ফুরিয়ে গেল। আলোটা মিটমিট করছে, উঠছে-নামছে, আমি দেখছি। খুব লালচে হয়ে গেল, তারপর দপ করে নিভে যেতেই দেখলাম, বলার ছায়াটা লাফিয়ে ঘরের চালে উঠেছে। হারিকেন আরও একটা টিমটিম করে জ্বলছিল অবশ্য। এই সময় পণ্ডিতমশাই ঘরে ঢুকেই বললেন, যা, আজ সব বাড়ি যা। মনে হলো দাশুমাস্টারের মুখটা অন্ধকারের মধ্যে আরও অন্ধকার। কথাটা বলেই আবার তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নেভা হারিকেন নিয়ে আমরা দু-ভাই বেরিয়ে এলাম।

এই জীবনে আর বলার সঙ্গে কথা বলব না। আগুরিরা আসুক আর না-আসুক, ও কেন অমনি করে ভয় দেখাবে। বাড়ি পর্যন্ত আমি শহিদুলের সঙ্গেও একটি কথা বলিনি। রাতে যে বিছানাটা আমি খানিক পরেই ভিজিয়ে ফেলব, সেখানে শুয়েছি। ঘরে আলো বলতে নেই, শুধু একটা নীল ফোঁটা দেখা যাচ্ছে। বাবা কবে একটা পেতলের ছোট বেডল্যাম্প কিনে এনেছিলেন। ছোটবেলা থেকে ওটা দেখছি, কেরোসিনে জ্বলত। সেটা এত কমিয়ে জ্বালানো যেত যে একটা ছোট্ট নীল ফোঁটা

ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। ওতেই বাবার বেশ চলে যেত।

রাত খানিকটা বেড়েছে, মা ঘুমিয়েছে, ছোট ভাইটা ঘুমিয়েছে। অনেকটা দূরে আলাদা বিছানায় বাবা চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে আছেন। তিনি ঘুমিয়েছেন কি না বোঝবার জো নেই। তাঁর ঘুম আর জাগার মধ্যে কোনো তফাত নেই। দরকার হলেই তাঁর টরটরে গলা শোনা যাবে, কে?

কতক্ষণে এসে পৌঁছুবে নাসগাঁয়ের আগুরিরা? হাতে সিঁদুর-লেপা খাঁড়া কিংবা টাঙি, নাকের তলায় টাঙি-গোঁফ, খচখচ করে মানুষের মাথা মাটিতে পড়ছে, এক জায়গায় গাদা হচ্ছে, দু-চারটে এদিক-ওদিক গড়িয়ে যাচ্ছে, এখানে আমার মাথা, ওদিকে মায়ের বা ভাইয়ের আর একদিকে বাবার—না, অসম্ভব, বাবার মাথা কাটার সাধ্যি কারও নেই, অসম্ভব। কিছুতেই ঘুমুতে পারছি না, এপাশ-ওপাশ করছি, আর খুবই অবাক লাগছে, এদের কারও তাপ-উত্তাপ নেই, দিব্যি খেয়েদেয়ে আলো নিভিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল! ওরা কি জানে না, আজই তাদের শেষ রাত! তবে আমি বলেই বা কী করব, শুনে এমন করে হাসবে যে মাটিতে মিশে যাব।

হাঁটু দুটো বুকে, হাত দুটো দু-হাঁটুর মাঝখানে, ঘুমিয়ে পড়েছি। কখন বাইরে কাদের কথা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ঘরে ভোরের আলো আসছে। নীল ফোঁটাটা ঠিকই জ্বলছে। কারা যেন কোন ভাষায় কথা বলছে, মনে হচ্ছে বাংলা ভাষা নয়। বর্ধমান শহরে বিহারিরা যেমন কথা বলে তেমনি। একবারও মনে হচ্ছে না নাসগাঁয়ের আগুরিরা ও-রকম করে কথা বলবে কেন? ধড়মড় করে উঠে বসেছি বিছানায়। এর মধ্যেই কথা বলতে বলতে তারা মাঠের দিকে চলে গেল। ভাঙা গলায় একটা কাক ডেকে উঠল। কই, কিছুই হলো না তো, শুধু সকাল হলো। আগের কদিনের মতোই, সকাল আছে কিন্তু দিনের আলো নেই।

সারা দিন ধরে ভাবছি, আজ আর সাঁঝবেলায় পড়তে পাঠশালা যাব না। হারিকেনের কাচ পরিষ্কার করা, তেল ভরার কাজ একদিন আমার, একদিন শহিদুলের। আজ শহিদুলের। সন্ধে লাগতেই সে এসে বলল, চ'। বসার চট আর দপ্তর নিয়ে আজ আমি শহিদুলের পিছু পিছু হাঁটছি। পাঠশালে এসে দেখি আর সবাই এসেছে, বলা তখনো আসেনি। তিলে খচ্চর শুয়োরটা আজ না এলেই ভালো। এক নম্বর মিথ্যুক। এই বলা, তুই কি জানিস, তোর মতো বজ্জাত পাঁঠা ভূ-ভারতে নেই? আচ্ছা, বলার কথা কাল তো সবাই শুনেছিল, শহিদুলও ছিল—কই, কারও কিছু হলো না, ভয়টা ও-রকম হুড়কোর মতো গলায় আটকে গেল কেন? এখনো লেগে আছে আড়াআড়ি—আলোটালো জ্বালতে জ্বালতে এইসব ভাবছি, বলা এসে ঢুকল। মুখে তার সেইসব অদ্ভুত ছড়া—জল জঙ্গল আঁধার রাত, এঁড়েগরু নেড়ে জাত—বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস নাই। কালো বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোচমান—বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস নাই। মাইরি, সব চলে এয়েছ, দাশুপণ্ডিতের বাঁধা বলদ, জাবনা খাবে গো—বলে বলা এগিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। আমার এমন রাগ হলো, মারলাম এক গুঁতো ওর বুকে। ব্যস, আর কোনো কথা নেই, বলা এক ঝটকায় আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল। আমি আঁকুপাঁকু করছি, ছেঁচড়ে নেমে পড়তে চাইছি। পড়ে যাবার ভয়ে বলার চুল দু-হাতে খামচে ধরলাম কিন্তু চুলে জবজবে করে সরষের তেল মাখানো, হাত পিছলে পিছলে যাচ্ছে। বলা দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে দিচ্ছে, আবার চেপে ধরছে আমার দু-ঠ্যাং—গিজাং গিজাং ছ-শ গিজাং, ও মা দিগম্বরী একবার নাচো গো, আজুলরে, রাগ করছিস কেন, তোদের আর মেয়াদ নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, খুব জানা আছে তোদের নাসগাঁয়ের আগুরিদের। ধারসোনার লেঠেলরা সব আসছে, ঘিলু ফাটানো হবে আগুরিদের। কাল এল তাঁরা? খবর চলে গিয়েছে ধারসোনায়, আগুরিদের পোঁদ থেকে লেজ টেনে টেনে বার কর গা যা।

কথা কটা বলে আমার খুব আরাম হলো। কিন্তু গলা কাঁপছিল তা বুঝতে পারছিলাম। গত রাতটা পার হয়েছে, আজ আবার এসেছে রাত। সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, আমার দিকে চেয়েও দেখবে না কেউ। নাসগাঁয়ের আগুরিরা আসুক আর না আসুক, আমি রাতটা পার করব কেমন করে? আমার কথা শুনে বলা শুধু বলেছে, আচ্ছা, ঠিক আছে, যা—এক একটা খাঁড়ার ওজন হচ্ছে দশ সের। বড়-বেলুনের বড়-কালীর বলির রক্ত মাটিতে পড়ে না, সোজা মায়ের মুখে যায়, জিভ দিয়ে টপটপ করে পড়ে রক্ত—সেই রক্তের পেসাদ মাখানো খাঁড়া, বুঝবি—বলে একটু মুচকি হেসে বলা বই খুলে পড়ায় মন দিল। একটু পরেই দেখি দাশুমাস্টার ঘরে ঢুকলেন। আজ কি খোনা ফকিরের দোকানে তামাক খেতে যাননি! আশ্চর্য, এসেই বললেন, যা যা—খুব পড়া পড়েছিস! বাড়ি যা।

আমরা চলে যাচ্ছি এই সময় বলা যেন আনমনেই বলল, কাল আসেনি কোনো কারণে, আজ আসবেই। ইস, কী করল বলা হারামজাদা! সঙ্গে সঙ্গে গতকালকের রাতটা বেড়ালের মতো এক লাফে ফিরে এসে আজকের রাতের সঙ্গে মিশে গেল। পাতলা মাষকলাইয়ের ডাল আর ভাজা ছোলাবাটা দিয়ে ভাত খেয়েছি, খাওয়ার সময় জানু ধাক্কা দিয়ে আমাকে আমার জায়গা থেকে সরিয়ে নিজে বসেছে। অন্যদিন হলে কিছুতেই তা পারত না, ওর ঝাঁকু চুল ধরে দু-বার হ্যাঁচকা টান দিলেই আমার জায়গা ছেড়ে দিতে পথ পেত না। কিছুই করিনি আমি। সব কেমন চোখের সামনে দিয়ে স্বপ্নের মতো ভেসে গেল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। তবে ঘুম ভেঙেছে খুব সকালে, অত সকালে ভাঙে না আমার ঘুম। ভাঙা গলায় কালকের সেই কাকটা ডাকল বটে, তবে কোথা থেকে একটা পিউ কাঁহা-ও ডেকে উঠল আর বোধ হয় এক লক্ষ চড়ুই কিচিরমিচির করছিল। আজও কিছু হলো না, শুধু সকালই হলো।

আমরা গাঁয়ে সব মুখ গুঁজে থাকি। বালিশে মুখ গুঁজে, ভাতের থালায় মুখ গুঁজে, দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে বা কাদানো জমিতে পানি-কাদায় মুখ গুঁজে। হেঁট হয়ে ভুঁয়ে ধান রুইতে হয়, হেঁট হয়ে ধান কাটতে হয়, লাঙলের ফাল আর গরু-মোষের পায়ের দিকে চাইতে চাইতে জমি চষতে হয়। ঘাড় ঘুরিয়ে আশেপাশে চেয়ে দেখার উপায় নেই। পচা আমানি, খোল, ভুসি, ছানিভরা পাত্‌নায় মোষ ঠিক অমনি করেই মুখ গুঁজে জাবনা খায়। পাশের ক্ষীরগাঁয়ে পোস্টাফিস একটা আছে বটে, ধুতির ওপর খাকি রঙের মোটা একটা জামা গায়ে ধুলোভরা খালি পায়ে কোটালপাড়ার নগা পিয়ন সপ্তাহে দু-দিন চিঠিপত্র নিয়ে আসে কিন্তু সারা গাঁয়ে চিঠি আর কটা থাকে? লোকটা এলেই যেন একটু বাতাসও সাথে সাথে আসে। অতি বলবান পিয়ন দাদা, গলার স্বরটা মেয়েলি, ভারি ভালোমানুষ। মাঝে মাঝে এক সপ্তাহ দু-সপ্তাহ একদম আসে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, কারও কোনো চিঠি ছিল না যে দাদা! এ গাঁয়ে তবু কিছু না কিছু থাকে, বিশেষ তোমার বাবা বোর্ডের পেসিডেন্ট তো, সরকারি চিঠিপত্তরের সঙ্গে *বঙ্গবাসী* কাগজটা অন্তত দিতে আসতে হয়।

আমাদের কোঠাঘরের পশ্চিমের জানলায় বসলে পশ্চিমে এক ক্রোশ মাঠ পেরিয়ে নিগন স্টেশন পর্যন্ত দেখা যায়, স্টেশনের লাল টিনের চাল দেখা যায়, তারপর আর নয়। কিন্তু *বঙ্গবাসী* কাগজটা খুললে মনে হয় আরও দুটো একটা খোলা জানলার ধারে বসে আছি। পড়তে আজকাল ভালোই পারি, তবে পড়তে পারলে সবকিছু বুঝতে পারা যাবে তা তো নয়। আগে আগে বেশ যুদ্ধের খবর থাকত, পড়তে ভারি মজা, কোথায় কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে, আমার কী, আমাদের গাঁয়ে তো আর আঁচ লাগছে না। জাপানে যুদ্ধ, বর্মায় যুদ্ধ, বর্মার জঙ্গল পেরিয়ে কত লোক পালিয়ে আসছে, হিটলার, সুভাষচন্দ্র, আজাদ হিন্দ ফৌজ—এই রকম কত কথা শুনতাম, ভুলে যেতাম, তখন মনে হতো বটে নিগনই দুনিয়ার শেষ নয়, বর্ধমান শহরও নয়—মনে হতো, কোথায় কত দূরে বোমা পড়ছে, হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক মরছে। সব ভেসে চলে যেত। তারপরে ফুফুর মুখে খালি শুনতাম, মাগগি—সব মাগগি। মাগগি মানে দাম বেশি। তাতেই বা আমাদের কী? ভারি তো কিনি জিনিস আমরা। চাল-ডাল কি কিনতে যাচ্ছি? কই, তেল, দুধ, গুড়—কিছুই তো কিনি না আমরা। হ্যাঁ, কাপড় কিনতে হয় বটে, চিনি, কেরোসিন, কয়লা—এসবও কিনতে হয়। যুদ্ধর বাজার, মাগগির বাজার, ভিখ-ও মেলে না য্যাখন ত্যাখনই তো আকাল দুর্ভিক্ষ—মা-চাচিরা খুব বলত। আমরা দেখতাম, গুম গুম শব্দে মাথার অনেক ওপর দিয়ে উড়োজাহাজের দল উড়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো কড়কড় শব্দে বাড়িঘর গাছপালার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে দু-একটা। আর দেখেছি মামাবাড়ি যাবার পাকা সরানে মিলিটারি-জিপ আর লালমুখো সব গোরা সেপাই। জিপে গরু-মোষের গাড়ি উল্টে ফেলে দিত, ফিরেও দেখত না। মামাবাড়ির দিকের গাঁয়েও ঢুকত কখনো কখনো। *বঙ্গবাসী* কাগজে এই রকম খবর আগে কত থাকত, এখন

আর তত থাকে না। তার জায়গায় কী যে হয়েছে, খালি ঘুরেফিরে কতকগুলো মানুষের নাম—গান্ধী, নেহরু, জিন্না, প্যাটেল, শরৎ বোস, আবুল হাশিম, মৌলানা আজাদ, শ্যামাপ্রসাদ, শেরেবাংলা ফজলুল হক আর ফিরে ফিরে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা। আমার তখন মনে হতো, খবরের কাগজ বোধ হয় ওই রকমই। খুনের খবর থাকবে, রাহাজানির খবর থাকবে—মানে যত সব উদ্‌ভট্টি কথা। কই, এত বড় হয়ে গেলাম, গাঁয়ে ওসব কিছুই নেই। চুরিটুরি হয় বটে; কলা, মুলো, ধান, চাল কখনো কখনো; কিল-ঘুষি মারে মানুষ কখনো। মারামারি করে জড়াজড়ি করে, লাঠিটাঠিও চালায়। কিন্তু ঘরে খিল কেউ দেয় না, সব খোলাই থাকে। সদর দরজা আছে এমন বাড়িই বা কটা? দু-একটা ছাড়া সব বাড়িতেই যেকোনো দিক দিয়ে ঢোকা যায়।

আমাদের দলিজে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস ছিল বলেই বোধ হয় কাগজটা আসত। বলতে গেলে ওইটাই সারা গাঁয়ের কাগজ। নন্দীবাড়ির যতীন কাকা এসে খুব যত্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজটা পড়ত। বাবার চিরকালের বিরোধী গিরে রায় কাগজটা পড়ত হতচ্ছেদ্দা করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বসলেই যেন তার মান যাবে। পড়া হয়ে গেলেই দুমড়েমুচড়ে টেবিলে ফেলে দিয়ে বিরাট পালোয়ানের মতো দেহটা নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে যেত। আগে আগে কাগজটা দেখে আমার একটুও ভালো লাগত না। পড়া হয়ে গেলে কাগজটা যত্নের সাথে ভাঁজ করে বাবা বলতেন, যা তো, ননুর বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আয়, ভুতো গাঁয়ে এসেছে, সে পড়বে। ভুতো হলো ননু কাকার দাদা, ভূতনাথ। তিনি কলকাতা না কোথায় চাকরি করতেন।

বঙ্গবাসীর ঘুলঘুলি দিয়ে কতটাই বা দেখা যায়, কতটা আলোই বা আসতে পারে? আমি আগে প্রায় কিছুই দেখতে পেতাম না। বানান করে করে পড়া, অনেক কথারই মানে জানি না, অনেক কথা এত অদ্ভুত—মনে হয় মানুষের নাম, জিনিসের নাম বা জায়গার নাম এসব কথা। এখন তো ক্লাস ফোরে পড়ছি, এখন মোটামুটি ঝরঝর করে পড়তে পারি, বুঝি আর না বুঝি। এখন দেখছি যুদ্ধের কথা অনেক কম। ছ বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল, সারা দুনিয়াজুড়ে হয়েছিল, দুটো ভয়ঙ্কর বোমা পড়েছিল, তাতে কত লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল, কত লক্ষ ইহুদি মেরে ফেলেছিল, দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তাতেও লাখ লাখ লোক মরেছিল। এই যুদ্ধ বছরখানেক আগে বন্ধ হয়েছে। এখন সব অন্য কথা, অন্য খবর: সংকটাপন্ন, পরিস্থিতি, মুখোমুখি, ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র দেশের দাবিতে মুসলিম লীগ অনড়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গার পরিস্থিতি, ক্রিপস মিশন ব্যর্থ, নারকীয়, পাশবিক—এমন কথার প্রায় কোনোটারই ঠিক ঠিক মানে বুঝতে পারি না। দিন কাটে আর মনে হয় গাঁয়ের মানুষের চাহনি বদলে যাচ্ছে, কত রকম করে চেয়ে দেখত মানুষ—কারও মজা, কারও আমোদ, কারও ভালোবাসা, ঠাট্টা কিংবা রাগ—এখন মনে হয় আমাদের হিরণপুরের বুনো মোষটা যেমন চোখের কোণ দিয়ে তাকায়, টকটকে লাল হিংসা যেন ফেটে বেরোয় চোখ দিয়ে, গাঁয়ের অনেকের চাহনি এই রকম। তারপর সুবলের কথায়—বামুনদের লক্ষ্মীদাকে কলকাতায় কেটে ফেলেছে—সেদিনই কোথা থেকে উড়ে এল কালো ছায়া, তার ওপরে আর এক পোঁচ কালো ছায়া, পোঁচের পর পোঁচ—কালো কালো ছায়া দিনগুলোকে নিভিয়েই ফেলল।

আগুরিরা পরের রাতেও যখন এল না, কিছুই হলো না, শুধু রাতটা ভীষণ কষ্টে কষ্টে, যেন কিছুতেই শেষ হবে না এমনি করতে করতে শেষ পর্যন্ত কেটে গেল আর সকালটা এসে পড়ল, তখন সুয্যিতে যেন অনেকটা আগের মতোই আলো ছিল। আজ বলার মাথাটা আমি ফাটাবই ফাটাব। আজ আমরা দু-ভাই সকলের আগে পাঠশালে এসেছি। হারিকেনটা জ্বালিনি, এমন করে খানিকক্ষণ আঁধার ঘরে বসে থাকায় আমাদের নিজেদেরই ভূত ভূত লাগতে শুরু করেছে, তখন দেখছি ভূতের মতোই আসছে সুবল, দুকড়ি, খুদে। বলার তখনো কোনো পাত্তা নেই।

দুটো হারিকেন জ্বালানো হলো। আমাদের দুজনের মুখের দিকে কেউ দেখছে না, কথাও বলছে না কেউ। এমন সময় বলা একেবারে জ্বালানো হারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকতে বলল, এইসব ফচকে ছোঁড়ার দল, সজ্ঞে না লাগতেই এ্যার্কি মারতে এসে হাজির হয়েছে।

আমি তো ঠিকই করেছি, বলার সঙ্গে কথা বলব না, ও ঠিক মানুষ খুন করতে পারে। আজ আমিও ওকে খুন করতে পারি। মিথ্যুক, বজ্জাত, শয়তান, খচ্‌রা। কেউই কোনো কথা বলছে না দেখে বলা একে একে সবার মুখের দিকে চেয়ে দেখে। প্রথমে সে প্রফুল্লের থুতনিটা ধরে নেড়ে দেয়, তারপর দুকড়ির নাকটা টিপে ধরে বলে, ওরে আমার ভ্যাঁ-কাঁদুনে ফুলুটওয়ালার ছেলে, একবার ভ্যাঁ করো তো বাপু। তাতেও কেউ কোনো কথা বলছে না দেখে সে সোজা আমার দিকে চেয়ে বলল, আর তুমি চাঁদু, রেগে পকপকে হয়ে গেছ। ওরে আসবে না, আসবে না, আগুরিরা আসবে না, তোমার সঙ্গে একটু মজা মারছিলাম, জাদু...।

আগুন হয়ে উঠলাম, তুই, তুই—আচ্ছা, তুই এত খচ্চর কেন? শালা চাঁড়াল, ডোম, পাঁঠা কোথাকার!

বলা ছিটকে ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালের কাছে চলে গেল। শুধু তার হারিকেনটাই জ্বলছে, আলোর চেয়ে ছায়া বেশি, ঘাড় কাত করে আমার দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ ষাঁড়ের মতো ঘাড় নামিয়ে ওরে, আমাদের আজুলকে কে কাটে রে বলে ছুটে এসে আমার দু-পায়ের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে এক ঝটকায় আমাকে কাঁধে তুলে ফেলল। গাজনের সন্নিসির মতো নাচছে আর বলছে, কোন আগুরির ক্ষমতা আছে, আসুক দেখি, আসুক দেখি, আসুক দেখি। আমার ভীষণ কাতুকুতু লাগছে, দমাদম কিল মারছি বলার পিঠে, নামিয়ে দে, নামিয়ে দে বলা। আর সবাই হেসে কুটিকুটি, শুধু একফাঁকে হঠাৎ দেখি খুদে চেয়ে আছে ঠিক যেন আমাদের হিরণপুর হাটের মোষটা, তেমনি তেরছা চাহনি, চোখের কোণটা লাল। সে বিড়বিড় করছে, হাঃ, নেড়ের বাচ্চাকে মাথায় তুলেছে!

বলা আমাকে মাটিতে নামিয়েছে কি নামায়নি, ঝড়ের মতো দাশুমাস্টার এসে ঘরে ঢুকলেন। ঠিকমতো আলোগুলো জ্বালানো হয়নি। কোনো দিকে না চেয়ে দাশুমাস্টার বললেন, এই, তোরা দু-ভাই আমার সঙ্গে আয়। আর তোরা সব সোজা বাড়ি চলে যা।

আমাদের হারিকেনের বাতি একদম কমানো। মাস্টারমশাইয়ের পিছু পিছু আমরা দু-ভাই হাঁটছি। চাঁদ নেই, অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসছে। কাত্যায়নী ঠাকরানির মাটির বাড়িটা এদিকের শেষ হিঁদুবাড়ি। ঠাকরানি বহুদিন দেশছাড়া, বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। ওই বাড়ির পরেই খোনা ফকিরের দোকানের পাশ দিয়ে শিবতলার দিকে যাবার গলিরাস্তাটা, তার পরেই মোসলমানপাড়ার শুরু আর শুরুতেই আমাদের ফাঁকা নতুন বাড়ি। এই বাড়িটা বাবা কিনেছিলেন বিনোদবাবুর কাছ থেকে। সে জন্য এখনো ওটা বিনোদবাবুর বাড়ি। আমরা পুরোনো বাড়িতেই থাকি। এ বাড়িটা পড়ে আছে খালি। একটা পেয়ারা গাছ, দু-কোণে দুটি ডুমুরগাছ। গাধাপুইনি, কাঁটানটে আর ঘাসে ভরা বাড়িটা। কাছে আসতেই দেখি দেয়াল ঘেঁষে ঠিক কোণের কাছটায় অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষগুলোকে আবছা দেখা যাচ্ছে, কারা আছে, কে কে আছে বোঝার উপায় নেই। একজন একটু কাছে এগিয়ে এল, দেখলাম শ্রীধর কাকা, তার হাতে একটা পাঁঠা কাটার টাঙি, একবার যেন মনে হলো, খোনা ফকিরের বড় ছেলে শংকরীদা আর বোধ হয় আগুরিদের বেন্দাবনদাকে দেখলাম। সকলেরই হাতে কিছু না কিছু আছে, লাঠি, হুড়কো, বগি—এইসব।

একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, কে যায়, মোল্লাদের ছেলে দুটি? দাশুমাস্টার কথা বলে উঠলেন। গলা নয় যেন শানানো ইস্পাত, খবরদার, আমার ছাত্তর ওরা। আমি ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। ...এইখানেই ওদের ছেড়ে দাও মাস্টার, আর এগিয়ো না। মোচনরা সব ওদের আস্তানায় জড়ো হয়েছে। ...সে আমি দেখছি, দাশুমাস্টার বললেন। আর তো দু-পা—শুকনোর দিনে ধুলোভরা রাস্তায় পা ডুবে যাচ্ছে। এইটুকু রাস্তা, মনে হচ্ছে অনেক দূর। আস্তানায় এসে দেখি সারা মোসলমানপাড়ার মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে। একদিকে আস্তানার ইটের ভাঙা মিনার, তার মাথায় পাকুড়গাছের চারা আর একদিকে ফাঁকা উঠোনের মতো জায়গা। সেখানে আমরা হাডুডু, হিঙেডারি খেলি, মাদার মহররম সব সেখানেই শুরু হয়। জায়গাটা এখন মানুষে ভরা। সবার হাতেই বাঁশ, লাঠি, একটা-দুটো কিরিচ। লাঠিওয়ালারাই বেশি। মোসলমানপাড়ার বাকি নেই কেউ; শুধু বাবা, নাজির বক্স চাচার বুড়ো বাপ—এ রকম কয়েকজন নেই। এমনকি লতিফ চাচার মতো

আঁধার নামার আগেই পাঠশালে হাজির

আধবয়েসি মানুষটাও কোঁচরভর্তি কী কী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাশুমাস্টার একেবারে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে বললেন, এই শোনো তোমরা, মোল্লাবাড়ির ছেলেদুটি আমার কাছে পড়তে যায়। ওদের দিয়ে গেলাম। কেউ কোনো কথা বলল না। যা, এখানে দাঁড়াস না, বাড়ি চলে যা, এই বলে মাস্টারমশাই নিজের বাড়ির দিকে ফিরলেন। কেউ একটি কথাও বলল না। ধুলোভরা সাদা আঁধারে দাশুমাস্টার একবারে মিলিয়ে গেলে একজন বলে উঠল, কপাল ভালো মাস্টারের, ভালোয় ভালোয় ফিরে গেল!

মনে হলো, মোসলমানপাড়ার সবাই এসেছে। তবে মোটমাট কটাই বা লোক? সবসুদ্ধ এক শ হয় কি না! লাঠি ঠুকতে ঠুকতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে মল্লিকবাড়ির ফকির চাচা। তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে খুব খারাপ একটা পচা ঘা। ওই ঘা বহুকাল ধরে শুকোয়নি। পানসে রক্ত গড়িয়ে পড়ে সেখান থেকে। হাড়-মাংস খসে পড়েছে, আঙুলটার আর সামান্যই বাকি। লোকে বলে কুঠ্ হয়েছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাছে এসে আমাকে দেখে বলল, কী বলব বাপ, আল্লা মেরে রেখেছে, নাইলে ওইকটা হিঁদু মালাউনকে এক লাপটেই সাবড়ে দেতম। লতিফ চাচা কোঁচড়ে কী নিয়ে যেন ঘুরছে। একজন বলল, বালি, সামনাসামনি হলেই হিঁদুগুনোর চোখে বালি ছুড়ে একদম কানা করে দেওয়া হবে, তারপর পিটিয়ে, ঠেঙিয়ে কিংবা কুপিয়ে কুপিয়ে মারো কেন আরাম করে। শুনলাম খবর দেওয়া হয়েছে সেই লেঠেলদের গাঁ ধারসোনায়, আসছে তারা সব। অবশ্যি হিঁদুরাও তাদের হিঁদু-গাঁ ক্ষীরগাঁয়ে খবর দিয়েছে—ভয়-পেদো হিঁদুরা আসবে কি না কে জানে। মোসলমানপাড়ায় ঢোকার মোড়ে মোড়ে আড়াআড়ি করে গরু-মোষের গাড়ি রেখে দেওয়া হয়েছে। ওইসব পেরিয়ে আসতে আসতেই তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হবে। ভারি মজা! গাঁয়ে শুধু হিঁদু আর মোসলমানরা আছে! ওহিদ চাচা, ব্যাঁকা চাচা, ননু কাকা, ভুতো কাকা, মোবাই শেখ, মনবশ্ চাচা, ষষ্ঠীদা, পঞ্চাদা, পঞ্চা হাড়ি, চক্কোবত্তি মশাই, আশু ভশ্চায্যি, রাম সামন্ত—এরা কেউ নেই। কোনো দিন ছিলও না। শুধু হিঁদু আর মোসলমান আছে।

পণ্ডিতমশাই বলে গেলেন, আগে বাড়ি যা, কোথাও দাঁড়াবি না। এতক্ষণ আমরা দু-ভাই বোকার মতো ঘোরাঘুরি করছিলাম, শেখদের বাড়ির নাছ-দুয়োরের পাশের গলি দিয়ে বাড়ি যাব, শুনতে পেলাম, ও-বাড়ির একটা ঘর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে মেদিনী ফাটাচ্ছে। দুয়োর খুলে দে, খুলে দে বলছি, এই মা, হারামজাদি, দুয়োর খোল, মালাউনের বংশ রাখব না, একবার ছেড়ে দে খালি। খুলবি না? এই ভাঙলাম দুয়োর! দুমদাম শব্দ আসতে লাগল। ঘরে কিবরিয়া আটক আছে। ও কেমন খেপা সবাই জানে, মহররম খেলতে গিয়ে মানুষ খুন করার জোগাড় করে, মাদার নাচাতে গিয়ে এক একটা বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ও ছাড়া থাকলে এতক্ষণে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত।

ভাত দেবার সময় ফুফু একটি কথা বলেনি। আমরা সবাই মাথা নিচু করে খাচ্ছিলাম। রাত খুব তাড়াতাড়ি নিশুতি হয়ে যাচ্ছিল বলেই বোধ হয় আস্তানা আর বিনোদবাবুর বাড়ির কোণ থেকে হল্লা-চিৎকার অনেক স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। এমনকি দু-চারটে কথাও শোনা যাচ্ছিল। ভাতঘর থেকে বেরিয়ে কোনো চাচাকেও দেখতে পেলাম না। জানি না কেউ কেউ আস্তানায় গিয়েছে কি না।

ঘরে আজ অন্ধকার নীল ফোঁটাটা নেই। আলোই জ্বলছিল। বাবা বিছানার ওপর বসে। মা-ও ঘরে। দেয়ালে একনলা বন্দুকটা ঠেস দিয়ে রাখা, ফ্লুট বাঁশিটা একই জায়গায় রয়েছে, ভেসলিন-মাখানো খাঁড়াটাও দেয়ালে টাঙানো। বাবা মাকেই বলছিলেন, সন্ধেবেলায় ওবেদ শেখ তার দলিজে বসে ছিল। মোসলমানপাড়া থেকে হিঁদুপাড়ার দিকে গরুর গাড়ি যাবার রাস্তা সে বন্ধ করে দেবে। ওর গোয়ালের একদিকের কোণের দেয়াল গাড়ির চাকার ধাক্কা লেগে বারবার ভাঙছে বলে সে ও-পথে গাড়িই যেতে দেবে না। দেয়ালের কোণে একটা খুঁটো পুঁতে দিলেই তো দেয়াল বাঁচে! কবার নাকি তেমন খুঁটো পুঁতেছিল, কারা উপড়ে দিয়েছে। সে তাই রাগ করে একটা খুঁটো দিয়েছে দেয়ালের কোণে আর একটা রাস্তার ঠিক মাঝখানে। এটা সে করতে পারে না, সরকারি রাস্তা তো তুমি বন্ধ করতে পার না! এদিকে রামযুক্ত হাজরার গরুর গাড়ি আসছিল কয়লাটয়লা নিয়ে। হিঁদুপাড়ার রাস্তায় কাদা, সে মোসলমানপাড়া দিয়ে যাবে। রাস্তায় খুঁটো দেখে তার মেজাজ খারাপ। ওবেদ তো বসেই ছিল দলিজে, রামযুক্তটা গোঁয়ার, সে তাকে কোনো কথা না বলে রাস্তার মাঝখানের খুঁটোটা উপড়ে ফেলল। বেশ, তাই কর, খুঁটোটা উপড়ে ফেলে চলে যা, তা না, সে দেয়ালের কোণের খুঁটোটাও তুলে ফেলে দিল। ওবেদ নিজে উঠে এসে রামযুক্তর ঘাড় চেপে ধরল, রামযুক্ত, এই তোর গাড়ি আটকে দেলাম। দেখি তুই কেমন বাপের ব্যাটা, গাড়ি নিয়ে যা দেখি। বোধ হয় কিবরিয়া আশেপাশে ছিল, সে এক ছুটে এসে রামযুক্তের গলা ধরে ঝুলে পড়েছে। লেগে গেল ঝটাপটি। রামযুক্ত আমার সঙ্গে যাত্রায় সংয়ের পার্ট করত,

আমি জানি তার গায়ে খুব বল। এক ঝটকায় কিবরিয়াকে ঝেড়ে ফেলে সে শুধু বললে, গাড়ি যেতে দিবি না? গাড়ি যেতে দিবি না? এই থাকল গাড়ি, যাচ্ছি আমি। শালার নেড়ের খুব বাড় বেড়েছে। শালাদের পাড়া জ্বালিয়ে দেব আজ। এই বলে গাড়ি ওইখানেই রেখে রামযুক্ত চলে গেল। এখন গাড়ি মাঝখানে—এদিকে মোসলমানরা, ওদিকে হিঁদুরা। আমি জানি একটা কিছু ঘটবেই। বাতাসভরা বিষ। নিঃশ্বাস সবাইকেই নিতে হচ্ছে। বিষ ঢুকবে না?

বাবা বিছানায় উবু হয়ে বসে রইলেন। রাত আর একটু নিশুতি হয়েছে। আস্তানা থেকে যখন মোসলমানরা চিৎকার করে উঠছে, কান যেন ফাটিয়ে দিচ্ছে। খুব নোংরা গালাগালির কিছু কিছু শোনা যাচ্ছে। অন্যদিকে বিনোদবাবুর বাড়ির কোণ থেকে হিন্দুরা যখন হল্লা করে উঠছে, সেটা যেন আসছে অনেকটা দূর থেকে। আর যখন হিঁদু-মোসলমানরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে পড়বে গাঁয়ের মাথায়। হ্যাঁ, এইবার শোনা যাচ্ছে দাশুমাস্টারের গলা, অত বাজখাঁই নাকি পণ্ডিতমশাইয়ের গলা, অত জোর : বলি, তোমরা আমার একটা কথা শুনবে... কারা আবার চেঁচিয়ে উঠল, কথাটা কী তা আর শোনা হলো না। ভেসে এল আমার ন'চাচা, জব্বার চাচার গলা, এই, দাশুর কথাটা শোন তোরা, কী বলছে শোন...। আবার একটা বিকট চিৎকার, শোরগোল। জব্বার চাচার গলা চাপা পড়ে গেল। বিষ যখন গলা পর্যন্ত উঠে আসবে, হৈ দিয়ে আস্তানা থেকে ছুটে আসবে মোসলমানরা, দেয়ালের কোণ থেকে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে আসবে হিঁদুরা, ধুলোতে আঁধার ঢুকবে, কেউ কাউকে দেখতে পাবে না, লাঠির ঘা পড়ছে মাথায়, টাঙির কোপ পড়ছে ঘাড়ে। মুণ্ডু কেটে পড়ার শব্দ নেই একটুও, মাথা ফাটার ভীষণ শব্দ আছে, রক্ত গড়িয়ে পড়ার শব্দ এতই কম যে শোনা যায় না, ধুলোতে ফেনার রং বুঝতে পারা যায় না—উঃ, কিছুতেই ঢুকতে পারছি না ছোট গর্তটার মধ্যে। এই সময় আমাদের খামার থেকে ননু কাকার গলা পাওয়া গেল, বোন্‌ধা, বোন্‌ধা, বেরিয়ে আসুন। গাঁয়ে এত বড় সব্বনাশ হতে যাচ্ছে, আপনি ঘরে বসে থাকবেন? গাঁয়ের মাথা আপনি। আপনি চলুন।

বাবা বিছানা থেকে একটুও নড়লেন না, খামারের দিকে যাবার দরজায় খিল দেওয়া। বাবা ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, আমি যাব না, ননু। যেটুকু ঘটেছে, এটুকু যখন ঘটতে পেরেছে তখন আমি আর গাঁয়ের মাথা নই। ফিরে যাও, ননু। যা পার তোমরা করো গা!

দাদা, একবার বাইরে আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলুন।

না। ননু, ফিরে যাও।

ননু কাকার গলা আর শোনা গেল না। বোধ হয় ফিরে গেল। মা একবার বললেন, এত করে ডাকছে, দাঙ্গায় রক্তারক্তি হবে, একবার গেলেই পারতে।

আস্তে আস্তে বাবা বললেন, তুমি জানো না, ননুর সাথে দুজন লোক ছিল, কংস

খবরদার, আমার ছাত্তর ওরা

বাউরি আর ছিষ্টিধর পাল। ওদের কাছে দাঁড়ানোর সাথে সাথে আমার ঘাড়ে টাঙি বসানোর কথা বলে এনেছে ননু।

কী অবাক যে হলো মা। এই গড্ডা গড্ডা চোখ বার করে বাবার দিকে চেয়ে রইল।

বিশ্বেস হচ্ছে না তো? কী করে বিশ্বেস হবে? শুধু তাই নয়, এখানে যদি কিছু করতে নাই-ই পারে তাইলে, ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে ওবেদের গোয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দামু বাউড়ি আর দুগো মুচি বেরিয়ে এসেই খাঁড়া চালাবে। এই দুটো খবরই আমি পেয়েছি।

মায়ের মুখ কেমনধারা হয়ে গেল। চোখের চাউনি কেমন খেপা খেপা, আমি যি ননুকে ভাই বলে মনে করি, ননু আমাকে যি বউদিদি বলে!

সেসব ঠিক আছে। সেসব মিছেও নয়। ননু আমাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসে। ননু-ভুতোর মা তো আমারও মা। আমি মরলে ওরা দু-ভাই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদবে।

তবু?

হ্যাঁ, তবু। দাঙ্গাফাঙ্গা ননু একটুও চায় না। ওর একটা হইচই গণ্ডগোলের অজুহাত পেলেই হলো। ননু আমাকে খুন করাবে। মানুষের মন কোন দিকে কোন দিকে যে যায় কেউ বলতে পারবে না। ননু আমাকে ভালোওবাসে, ঘেন্নাও করে।

ননু কাকারা ফিরে যাবার একটু পরে রাতটা ফাটিয়ে চৌচির করে হল্লা-চিৎকার আর গালাগালির ধুম পড়ে গেল। মনে হলো, আস্তানা থেকে মুসলমানরা খানিকটা এগিয়ে গেল আর হিঁদুরা দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। মা একটু কাছে এলে ভালো হতো, যা হতো হতো, মাকে জড়িয়ে ধরতাম।

হঠাৎ বাবা বললেন, আমি একবার যাব। যদি লেগেই যায়, আমি ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকব কেন? কথা শুনে মায়ের মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল। একটা কথা বলতে পারল না। বাবা বিড়বিড় করে যে কথাগুলো মাকে আর নিজেকে শোনানোর মতো করে বলছিলেন তার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। নিজের ভেতরকার অন্ধকার গর্তে এত ছোট হয়েছি আমি, তা-ও ঢুকতে পারছি না। বাবা বলছেন, ঠেলতে ঠেলতে কোথায় এনে ফেললে? মোসলমানরা যদি সবাই মোসলমান, হিঁদুরা যদি সবাই শুধুমাত্র হিঁদু, মাঝখানে আর যদি কিছু না থাকে, তাহলে মোসলমানদের সঙ্গে আমাকে থাকতেই হবে, হিঁদুরা আমাকে নেবে না। তাদের কাছে যাবই বা কেন?

বন্দুক নিয়ে যাবে? মা কাঁপতে কাঁপতে শুধুল।

না, বন্দুক নিয়ে যাব কেন? চোর-ডাকাতের জন্য বন্দুক আর কেউ যদি আমার বাড়িতে ঢুকে ঘরে আগুন দেয়, ছেলেমেয়ে, পরিবারকে খুন করতে আসে, তখন বন্দুক। এখন সবারই হাতে যা আছে আমার হাতেও তাই থাকবে।

মুখ কালো করে বাবা বসে থাকলেন। এ লোকটা যেন আমার ঠিক বাবা নয়। এইবার শুনতে পাচ্ছি, একটিমাত্র গলা আর সেই গলা শুনেই দেখতে পাচ্ছি, হিঁদু-মোসলমানরা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, দু-দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দু-দলকেই থামিয়ে দাশুমাস্টার বাজখাঁই গলায় চেঁচাচ্ছেন, থামো, থামো—কে কাকে মারতে যাচ্ছ? কার সঙ্গে কার শত্রুতা, অ্যাঁ, যে মারতে ছুটেছ? ওবেদ শেখ রামযুক্তর গাড়ি আটকেছে, তিলিপাড়ার বিষ্টুপদও তো আটকাতে পারত! এই তো কটা লোক তোমরা, কে কাকে মারবে ঠিক করো। এই লতিফ জব্বার, ইদিকে আয়, আমাকে কাটবি আয়, শুকনো শরীরে ছটাকখানেক রক্ত আছে, নিয়ে যা। দেখ, কী কাজে লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ন'চাচার গলা, রামযুক্ত, এই হতচ্ছাড়া, গাড়ি নিয়ে যা। ওবেদ ভাই, আর একটিও কথা বোলো না।

আরও কারা কারা কথা বলতে লাগল, আর কবার হৈ উঠল। এর মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে উঠেই আস্তানা আর বিনোদবাবুর বাড়ির দেয়ালের কোণে খুব খুঁজতে থাকি। না, কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নেই।